বাঙালির সর্বনাশ ও বামপন্থা

তথাগত রায়

বামপন্থা
ও
বাঙালির সর্বনাশ

তথাগত রায়

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা -৭০০ ০৭৩

অধ্যাপক তথাগত রায় তথাকথিত বামপন্থার আসল চেহারা জনগণের কাছে তাঁর নিবন্ধগুলির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। মার্কস্‌বাদীরা শুধু প্রচারের জোরে তাদের সিদ্ধান্তগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত ও অভ্রান্ত সত্য বলে প্রতিপন্ন করে আসছেন। সত্য ও তথ্য ঠিক তার বিপরীত। সারা বিশ্বে মার্কস্‌বাদ বিফল ও পরিত্যক্ত। পশ্চিমবাংলার বামপন্থী মার্কস্‌বাদী পার্টিগুলির চরিত্র স্বার্থপর, জনবিরোধী ও আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত। তাদের কথায় ও কাজে আকাশ পাতাল তফাত। বিভিন্ন প্রমাণ ও উদাহরণের সাহায্যে অধ্যাপক তথাগত রায় তাঁর যুক্তিবহুল প্রবন্ধগুলিতে এটা অভিনন্দনযোগ্যভাবে প্রতিপন্ন করেছেন।

জাতীয় অধ্যাপক মঞ্চ স্বল্পমূল্যে এই পুস্তিকা প্রকাশ করে জনগণের মহতী সেবা করেছেন। আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার বিশ্বাস ভাবপ্রবণ বাঙালি গত ৩৫ বছর ধরে মার্কস্‌বাদীদের অন্যায় অত্যাচার সন্ত্রাস সহ্য করছে শুধু তাদের ভ্রান্ত প্রচারে বশীভূত হয়ে। তথাগতবাবু এবং এই ধরনের লেখকদের যুক্তিপূর্ণ লেখাগুলির দ্বারা জনসাধারণের মোহভঙ্গ হবে এবং তারা বিশ্বজগতের গতির সঙ্গে পা মিলিয়ে এই ভ্রান্ত মতাদর্শকে ছুড়ে ফেলে দেবে এবং পশ্চিমবাংলাকে আবর্জনামুক্ত করে ভয়হীন ও সমৃদ্ধিশালী নতুন বাংলা গঠন করবে, যে বাংলা বৈভবপূর্ণ ভারত গঠনে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে।

বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী

প্রাক্তন সাংসদ

ও

প্রাক্তন রাজ্যপাল, উঃ প্রদেশ

নিবেদন

বহু দশক ধরে, অবিরাম প্রচারের ফলে, প্রতিপক্ষের নিশ্চেষ্টতায়, সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির মনে 'বামপন্থা', 'সাম্যবাদ', 'মার্কস্‌বাদ', 'কম্যুনিজম্' প্রভৃতি শব্দগুলির সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধার জায়গা তৈরি হয়েছে। কুড়ি বছর বাম শাসনে থেকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এখনো অনেকে বলেন, "না, বামপন্থী চিন্তাটা তো এমনিতে খারাপ নয়,.....এদের প্রায়োগটাই খারাপ!" এর পাশাপাশি বাঙালির মনে এখনো ধারণা গেড়ে বসে আছে যে, 'বামপন্থা' বা 'মার্ক্‌সবাদ' ব্যাপারটা 'বেশ আধুনিক, ফ্যাশনেব্‌ল'। যদিও সারা পৃথিবীতে আজ মার্কস্‌বাদের জায়গা বাজে কাগজের ঝুড়িতে, তবু পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতাসীন মার্কস্‌বাদীরা তাদের মতবাদের জন্য এরকম একটা সম্মানের জায়গা রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আজ শিক্ষিত বাঙালির কাছে এই কথা নিবেদন করার সময় এসেছে যে, মার্কসবাদ এক প্রাচীন মতবাদ, যা ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বর্জ্যে পরিণত হয়েছে। বোঝাবার সময় এসেছে যে দোষ শুধু প্রয়োগের নয়, দোষ নীতিরই, অর্থাৎ তত্ত্বেরই গোড়ায় গলদ। অতি সন্তোষের বিষয় যে এখন বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী এই ধারায় চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু স্রোতের বিপরীতে কিছু বলতে এখনো ইতস্তত করছেন। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু যুবকের মনেও বামপন্থা সম্বন্ধে মৌলিক প্রশ্নের উদয় হয়েছে, মনে হয়েছে এতদিন ধরে কি আমাদের আগাগোড়া ভুল শেখানো হচ্ছে ?

এই ধরনের কিছু প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা এই পুস্তিকা লেখার প্রয়াস। প্রয়োজন যদি অংশত মেটেও তা হলেই সব পরিশ্রম সার্থক হবে।

সর্বজনশ্রদ্ধেয়, একাধারে শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ, অগ্রজপ্রতিম আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী এই পুস্তিকার ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন এবং উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

১১ই মে ১৯৯৮, বুদ্ধপূর্ণিমা — *তথাগত রায়*

কলকাতা

ঃ সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি ঃ

তথাগত রায় (৬৬) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সল্টলেক ক্যাম্পাসে নির্মাণবিদ্যার অধ্যাপক ও প্রথম বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রাক্তন সভাপতি (২০০২-২০০৬) ও বর্তমানে জাতীয় কর্মসমিতির সক্রিয় সদস্য। বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় নিয়মিত লিখে থাকেন। লেখা প্রকাশিত হয়েছে 'দেশ', 'বর্তমান', 'স্বস্তিকা', 'পাঞ্চজন্য', 'স্টেটস্‌ম্যান', 'অমৃতবাজার', 'অর্গানাইজার' ইত্যাদি পত্রিকায়। পূর্বে রেলে কাজ করতেন এবং পাতাল রেল প্রকল্পের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। মতামতের দিক থেকে জাতীয়তাবাদ, হিন্দুত্ব ও ভারতীয় পরম্পরার প্রতি আনুগত্যে আপসহীন।

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

বহুল জনপ্রিয়তার ফলে এই পুস্তিকাটির দুটি সংস্করণ এর মধ্যেই নিঃশেষিত। এর মধ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে এবং হতে যাচ্ছে। তাই এই তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশ।

২৬ শে জানুয়ারি,২০১১ — তথাগত রায়

প্রজাতন্ত্র দিবস

এক ঃ দক্ষিণ ও বাম

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বাঙালির বামপন্থা নামক বিচিত্র মতবাদের মোকাবিলা করার সময় আজ উপস্থিত হয়েছে। গত প্রায় অর্ধেক শতক ধরে বাঙালি-বামপন্থীরা, বেশ খানিকটা সাফল্যের সঙ্গেই, মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করে এসেছে যে বামপন্থাই আধুনিক, বামপন্থা যুক্তিবাদী, বামপন্থাই সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রকৃষ্ট পন্থা। আজ চিন্তাশীল জাতীয়তাবাদী বাঙালির কর্তব্য এই চাকচিক্যময় খোলসটা ভেঙে, ভেতরের ভুসি বার করে, বামপন্থার আসল স্বরূপ মানুষের চোখের সামনে এনে দেওয়া।

কেন বামপন্থা একটি ভুসিতত্ত্ব, তার বিশ্লেষণ করতে হলে বামপন্থার উদ্ভব সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। কিন্তু তারও আগে প্রয়োজন এই ব্যাপারটা উপলব্ধি করা, যে দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে বামপন্থীদের ক্রমাগত অপপ্রচার ও ঢক্কানিনাদের ফলে বামপন্থা সম্বন্ধে বাঙালির, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার হিন্দু-বাঙালির, একটা অহেতুক মোহ তৈরি হয়েছে। মোহভঙ্গের জন্যে যুক্তি প্রয়োজন তো বটেই, কিন্তু তার সঙ্গে ধৈর্য প্রয়োজন, মোহগ্রস্ত মানুষের মনোভাবও বোঝা প্রয়োজন। চিন্তাশীল জাতীয়তাবাদী হিন্দু-বাঙালিকে স্বজাতির মোহভঙ্গ করাতে হলে এই যুক্তি, ধৈয ও উপলব্ধি সঙ্গে নিয়েই এগোতে হবে।

বামপন্থা কথাটির উদ্ভব ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রেওয়াজ ছিল (এখনও আছে) যে সরকারপক্ষ স্পিকারের ডানদিকে বসবেন, বিরোধীপক্ষ বাঁদিকে। এই শতকের গোড়ার থেকেই পার্লামেন্টে দুটি দলের প্রাধান্য দেখা যায়, একটি স্থিতাবস্থাবাদী কনজার্ভেটিভ বা রক্ষণশীল দল, অন্যটি সমাজতন্ত্রী লেবার বা শ্রমিক দল। রক্ষণশীল দলকে টোরি পার্টিও বলা হয়। যেহেতু বেশিরভাগ সময়েই রক্ষণশীল দল সরকার

গড়েছে, এবং শ্রমিক দল বিরোধীপক্ষে থেকেছে, এবং স্পিকারের বাঁদিকে বসেছে, সেইজন্য কালক্রমে সমাজতন্ত্রীদের সাথে বাঁদিকটা যুক্ত হয়ে যায়। এই সমাজতন্ত্রী লেবার পার্টি কিন্তু আদৌ মার্কসবাদী বা কমিউনিস্ট নয়, (প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনে কমিউনিস্ট পার্টি থাকলেও তা নামেমাত্র, তাদের পার্লামেন্টে একটিও আসন নেই)। এঁরা মূলত 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট' যাঁরা বহুদলীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার সরকারি মালিকানায় অল্পাধিক বিশ্বাস করেন। এঁদের মধ্যেও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসের তীব্রতা অনুযায়ী 'সফ্‌ট লেফ্‌ট ও হার্ড লেফ্‌ট' শ্রেণীবিভাগ আছে, অর্থাৎ একটুখানি বাঁদিকে, বা অনেকটা বাঁদিকে। কিন্তু সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে বাঁদিকটা যুক্ত হবার দরুন সমস্ত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদেরই বামপন্থী বলে অভিহিত করা হত, এর মধ্যে কমিউনিস্টরাও আছে।

আস্তে আস্তে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, কিন্তু বহুদলীয় গণতন্ত্রেও বিশ্বাসীদের গা থেকে বামপন্থী নামটা প্রায় মুছে যায়, এবং এখন বামপন্থী বলতে মূলত মার্কসবাদীদেরই বোঝায়। এটাই বর্তমান পরিস্থিতি এবং এই পুস্তিকায় 'বামপন্থী' ও 'মার্কসবাদী', শব্দগুলিতে সমার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে বামপন্থী দল বলতে বোঝায় সি পি আই (এম), সি পি আই, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি আই, সি পি আই (এল এল) প্রমুখ বিভিন্ন নকশালপন্থী দলগুলি প্রভৃতিকে। অপরপক্ষে কংগ্রেস, যারা পঞ্চাশের দশকে নিজেদের 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজে বিশ্বাসী' বলে নিজেদের ঘোষণা করেছিল, এবং এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে সেই অবস্থান থেকে সরে আসেনি (যদিও কার্যকারীভাবে এসেছে), আজকের অর্থে বামপন্থী দল নয়। কংগ্রেসকে এখন মধ্যপন্থী দল ধরা হয়, পরবর্তী অনুচ্ছেদে এই বিষয়ে আরো লেখা হয়েছে।

বামপন্থা যদি এই হয় তবে দক্ষিণপন্থা কী, এবং দক্ষিণপন্থী কারা ?

দক্ষিণপন্থী বলতে সাধারণত বোঝায় সেইসব মতাবলম্বীদের যাঁরা বেসরকারি মালিকানার উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশ্বাস করেন, এবং সর্বোপরি, যাঁরা নির্দ্বিধায় জাতীয়তাবাদী। ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলের সঙ্গে দক্ষিণপন্থার অতীত যোগের দরুণ অনেকসময় বলা হয় যে দক্ষিণপন্থীরা স্থিতাবস্থা রাখার সমর্থক। কিন্তু এই সংজ্ঞাটি ঠিক নয়, কারণ স্থিতাবস্থা তো সব জায়গায় এক নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান স্থিতাবস্থা, যা এই লেখকের নিবেদনে শ্মশানের অবস্থার কাছাকাছি, তা কোনো দক্ষিণপন্থীরই অভিপ্রেত নয়। এই অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যের সংজ্ঞা অনুযায়ী সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এবং রাজনীতির বাইরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও তার আদর্শে বিশ্বাসী মানুষকে দক্ষিণপন্থী বলে ধরা হয়। আঞ্চলিক দলগুলি, যেমন শিবসেনা, তেলেগু দেশম, অকালি, দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কজগম, অল-ইণ্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কজগম, অসম গণপরিষদ ইত্যাদিও মোটামুটি দক্ষিণপন্থী, যদিও এদের অনেকেরই (সকলের নয়) জাতীয়তাবাদে অল্পবিস্তর ভেজাল আছে। কংগ্রেসকে মধ্যপন্থী দল ধরা হয়, অর্থাৎ না দক্ষিণ না বাম। এবং যারা বাকি রইল, অর্থাৎ জনতা দল, লালু যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল, মুলায়ম সিংহের সমাজবাদী পার্টি, কাঁসিরামের বহুজন সমাজ পার্টি, এগুলি কোনো হিসেবের মধ্যেই পড়ে না। সংকীর্ণ জাতপাতের সুড়সুড়ি দিয়ে কোনো না কোনো নেতাকে টিকিয়ে রাখাই এইসব জগাখিচুড়ি বা গজকচ্ছপ দলের উদ্দেশ্য। বলা যেতে পারে এইগুলি নীতিহীন, এক-নেতা-কেন্দ্রিক দল, একজন নেতাকে ঘিরেই দল, ঐ নেতা না থাকলে দলও নেই।

গত বহু দশকের বামপন্থী অপপ্রচারের ফলে হিন্দু-বাঙালির মাথায় এই ধারণাটা খুব ভালভাবে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে যে বামপন্থাই প্রকৃষ্ট, বামপন্থাই উচিত, বামপন্থাই অভিপ্রেত; দক্ষিণপন্থা ঘৃণ্য, দক্ষিণপন্থা নোংরা, দক্ষিণপন্থা 'গরিবের ওপর বড়লোকের অত্যাচারের' সমর্থক।

বক্তৃতায়, লেখায়, পোস্টারে, হ্যাণ্ডবিলে, 'দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার ধারক ও বাহক' কথাটাকে এমনভাবে উচ্চারণ করা হয়েছে যেন এঁরা কুষ্ঠরুগীর কাছাকাছি, এঁরা শৌচকার্য করে হাত না ধুয়ে সেই হাতে খান, এরকম একটা ব্যাপার! ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে যে এরা দক্ষিণপন্থীরা সাধারণ বুদ্ধিতে বিশ্বাসী, (মার্কস-প্রমুখ কোনো 'মহাপুরুষ'-এর লেখা কেতাবে নন), এরা সমাজের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের নিরন্তর সংঘর্ষের বিরোধী, এরা সব শ্রেণীর মানুষেরই ভাল দেখতে চান, এবং সর্বোপরি এঁরা জাতীয়তাবাদী। এখন থেকে জাতীয়তাবাদী চিন্তাশীল হিন্দু-বাঙালিকে কথায় বার্তায় আচার আচরণে, বক্তৃতায়, লেখায়, এই ধারণাকে দূর করার জন্য প্রাণপণ সচেষ্ট হতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, 'চোরের মায়ের বড় গলা'। যে দোষে বামপন্থীরা পুরোপুরিভাবে দুষ্ট সেই সব দোষের অভিযোগই তারা দক্ষিণপন্থীদের ওপর চাপিয়ে দেবার নিরন্তর চেষ্টা করে গেছে। বস্তুত বামপন্থী নেতা, বর্তমানে বিস্মৃতপ্রায়, লেনিনের লেখাতেই আছে 'আমাদের প্রতিপক্ষীয়দের গায়ে জোচ্চোরের তক্‌মা ঝুলিয়ে দিতে হবে'। যেটা লেনিন বলেননি তা হল এই 'যাতে মানুষ বুঝতে না পারে যে প্রতিপক্ষ নয়, আমারই জোচ্চোর'।

দুই ঃ বামপন্থা কেন পরিত্যজ্য ঃ ভণ্ডামি

এখন প্রশ্ন, বামপন্থা বা বিশেষ করে বাঙালি-বামপন্থায় গলদ কোথায়, এবং তা পরিত্যজ্য কেন? প্রচুর কারণ। একটি একটি করে নিবেদন করা যাক্।

প্রথমত বামপন্থা ভণ্ড। আজ্ঞে হ্যাঁ, ভ, মূর্ধণ্য-ণ-এ ডয়, ভণ্ড। বামপন্থা যা প্রচার করে কাজে তা পালন করে না। যে কোনো বামপন্থী চিন্তার গোড়ার কথা, দেশের পুরো উৎপাদনের ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের (পড়ুন সরকারের) হাতে থাকবে। এটা গেলে বামপন্থার গোড়াই কাটা পড়ে গেল। অথচ কাজে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার ব্যক্তিগত পুঁজি টেনে আনার কথা বলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচার করে বেড়াচ্ছে এটা গরিবের সরকার, কিন্তু মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত, যাঁরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের সরকারি সাহায্যমুক্ত স্কুলে অনেক টাকা খরচ করে পড়াতে পারেন, তাঁরা ছাড়া আর কেউ, অর্থাৎ সাধারণ মধ্যবিত্ত ও গরিব আমজনতার ছেলেমেয়েরা, ভাল করে ইংরাজি শেখবার সুযোগ পাচ্ছে না, ফলে বহু চাকরির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এবং কি আশ্চর্য, এই ছোটবেলা থেকে ইংরাজি শেখানোর বিরোধী বামপন্থী সরকারের যাঁরা মাথা, অর্থাৎ মন্ত্রীরা, নিজেদের ছেলেমেয়েদের উচ্চবিত্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শামিল করছেন, অর্থাৎ তাদের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে না পাঠিয়ে খরচসাপেক্ষ বেসরকারি স্কুলে পাঠাচ্ছেন, যেখানে ছোটবেলা থেকেই ইংরাজি পড়ানো হয়। এটা ভণ্ডামি নয় তো ভণ্ডামি কী?

বামপন্থীরা অজুহাত দিতে চিরকালই খুব দক্ষ, এই অভিযোগের, বিশেষ করে ব্যক্তিগত পুঁজি টেনে আনার পক্ষে তাদের যুক্তি খাড়া— 'পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এটাই মার্কসবাদ' ! 'মার্কসবাদ কোনো অচলায়তন নয়, তাকে যুগোপযোগী করে নিতে হয়'—ইত্যাদি! সব মতবাদেরই কিছু মৌলিক বিশেষত্ব থাকে, যা বার করে নিলে সে মতবাদের অস্তিত্বই থাকে না। যেমন 'আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই, মহম্মদ আল্লাহের প্রেরিত

পুরুষ', এই বিশ্বাস ইসলামের গোড়ার ও শেষ কথা, একে বাদ দিলে ইসলামের কিছুই থাকে না, 'তেমনি, উৎপাদনের ক্ষমতা ব্যক্তিমালিকানা নয়, জনসাধারণের মালিকানায় রাখতে হবে' এই বিশ্বাস বাদ দিলেও বামপন্থার কিছুই থাকে না। অথচ এই বিশ্বাসে প্রথমে জল মিশিয়ে এবং তারপর পুরোপুরি বাদ দিয়ে, বামপন্থা বলে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই বিশ্বাস যে সারা পৃথিবীতে অপ্রমাণ হয়ে গেছে, তার থেকে প্রমাণ হয় যে বামপন্থা অন্তঃসারশূন্য, কিছু লোকের ক্ষমতা দখল করার মতলব ছাড়া কিছু নয়। এবং ইংরাজি শেখাবার ব্যাপারে বাঙালি-বামপন্থীদের দ্বিচারিতা খুব নীচুস্তরের ভণ্ডামি ছাড়াও আর কিছু নয়।

ধর্ম সম্বন্ধে বামপন্থীদের ভণ্ডামির কথা না বললে ইতিহাস সম্পূর্ণ হবে না। বামপন্থীরা বলে তারা নাস্তিক, তাদের প্রবক্তা মার্কস বলেছিলেন ধর্ম মানুষের অহিফেন স্বরূপ। কিন্তু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় ধ্বজার নিচে আনতে ভারতীয় বামপন্থীরা আশ্চর্য তৎপরতা দেখিয়েছে। কোটি কোটি নরনারীর চোখের জল ফেলার জন্য দায়ী দেশভাগ, দেশভাগের জন্য দায়ী মুসলিম লিগ নামক ধর্মান্ধ দল। অথচ ক্ষমতা দখলের জন্য এই মুসলিম লিগের সাথে গাঁটছাড়া বেঁধেছিলেন ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ, সি পি আই (এম) দলের সদ্যপ্রয়াত নেতা। এই দলের প্রাক্তন সচিব হরকিষণ সিং সুরজিৎ শিখ ধর্মের খালসা পন্থের প্রতীক 'পঞ্চ ক-কার' (কচ্ছা, কাংগা, কড়া, কৃপাণ, কেশ) ধারণ করতেন। অথচ তিনি ধর্মবিরোধী দলের নেতা ! পূর্ববঙ্গে মুসলিম মৌলবাদীর চোখের বালি এক নির্ভীক মহিলা তসলিমা নাসরিন, যিনি শুধু মুসলিমের হাতে হিন্দুর অত্যাচারের কথাই নয়, মুসলিমের অত্যাচারের কথাও লিখেছেন, মৌলবাদীদের চাপে তিনি আজ নির্বাসিত। আজ পর্যন্ত কোনো তথাকথিত ধর্মবিরোধী বামপন্থী তাঁর পক্ষে একটি কথাও বলেছে? অল্প কয়েকদিন আগে (জানুয়ারি, ২০১১) সিপিএম-এর পলিটবুরো সদস্যা বৃন্দা কারাত সরকারের কাছে দাবি করেছেন মসজিদের ইমামদের মাইনে বাড়াতে হবে। এই কি নাস্তিকতা ? এ সম্বন্ধে পরে আরো সবিস্তারে লেখা হয়েছে।

তিন ঃ মানবতার পরিপন্থী বামপন্থা

বামপন্থা পরিত্যজ্য তার দ্বিতীয় কারণ, বামপন্থা মানবতাবিরোধী। বামপন্থী কেতাবে নানারকম পরস্পরবিরোধী কথা লেখা আছে, কিন্তু কাজে একটা জিনিস পরিষ্কার ঃ বামপন্থার প্রথম ও শেষ লক্ষ্য যে কোনো উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, ও দখল কায়েম রাখা। এবং এই লক্ষ্যসাধনে বামপন্থীরা বিশ্বাস করে; 'দি এ্যাণ্ড জাসটিফাইস দা মিন্‌স্‌', অর্থাৎ এই উদ্দেশ্য সাধন করতে যা উপায় নেওয়া হয় তার ঔচিত্য-অনৌচিত্য ধর্তব্য নয়। কাজ হাসিল করতে বামপন্থীরা মানুষকে যন্ত্রবিশেষ বলে মনে করে। ব্যক্তিমানুষের বিশেষ জায়গা বামপন্থায় নেই—বিরাট রাজনৈতিক যন্ত্রের মধ্যে ব্যক্তিমানুষ বামপন্থীর কাছে একটি ছোট চাকা মাত্র, আর কিছু নয়। অবশ্যই এর কিছু ব্যতিক্রম আছে। বামপন্থী দলের একেবারে মাথায় যারা থাকে তারাই এর ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিগণের কথাতেই বিরাট যন্ত্র চলবে, বাকিদের কাজ শুধু হুকুম তামিল করা। এই হুকুম একেবারে ওপর থেকে আসবে, এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে। এই বন্দোবস্তের পোশাকি নাম ডেমোক্র্যাটিক সেন্ট্রালিজ্‌ম, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। এর পরিপন্থী ব্যবস্থা, যাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতামত নিয়ে রাজনৈতিক যন্ত্র চলবে, তার নাম ফেডারেলিজম্‌, যা যে কোনো বামপন্থীর কাছে অসহ্য। উল্লেখ্য, বর্তমান ভারতে বামপন্থীরা যে 'রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা চাই' বলে গলা ফাটায়, তা কিন্তু ফেডারেলিজ্‌মেরই দাবি। অর্থাৎ যেহেতু রাষ্ট্রব্যবস্থা আমাদের কুক্ষিগত নয়, সেইজন্য সেই ব্যবস্থার মধ্যে ফেডারেলিজম্‌ চাই, কিন্তু নিজের দলের মধ্যে কড়া সেন্ট্রালিজ্‌ম্‌ চালাব। এটি ভণ্ডামির আর একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু ভণ্ডামির কথা হয়ে গেছে, এবার মানবতার কথা।

বামপন্থীরা কখনো চায় না মানুষ ভালভাবে খেয়ে পরে বাঁচুক।

বামপন্থীরা চায় মানুষ আধপেটা খেতে পাক্ যাতে তাকে সামান্য খেতে দিলেই সে কৃতার্থ বোধ করে এবং পার্টি আর সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" একই সুরে বলা যেতে পারে, ভর্তি পেটে মার্কসবাদ হয় না। ভালভাবে খেতে পরতে পেলেই মানুষের অন্যান্য চাহিদা বাড়বে—তখন মানুষ প্রশ্ন করবে, শিখতে চাইবে, জানতে চাইবে, বামপন্থী তত্ত্বের ভুল ধরবার চেষ্টা করবে, আরো পাঁচটা জিনিস চাইবে যে চাহিদা পূরণ করা বামপন্থী সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না। এইজন্যই বামপন্থীরা এই ধরনের খাওয়াপরার অতিরিক্ত চাহিদাকে 'বুর্জোয়া বিলাসিতা' বলে। মানুষ গোরুভেড়া নয় যে আহার নিদ্রা মৈথুন হলেই সে সন্তুষ্ট থাকবে— কিন্তু বামপন্থীরা চায় আমজনতা মোটামুটি সেভাবেই থাকুক। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বর্ণিত কয়েকজন ব্যতিক্রমী মানুষ অবশ্যই বাদ দিয়ে।

এই ব্যতিক্রমী বামপন্থীরা আমজনতার থেকে বামপন্থী ব্যবস্থায় এতটাই পৃথক, যে এই ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে বিখ্যাত সাহিত্যিক জর্জ অরওয়েল তাঁর বিখ্যাত 'অ্যানিম্যাল ফার্ম' বইতে লিখেছিলেন "অল মেন আর ইকুয়াল, বাট সাম আর মোর ইকুয়াল"—অর্থাৎ (বামপন্থী ব্যবস্থায়) সব মানুষ সমান, কিন্তু কিছু মানুষ বেশি করে সমান! বস্তুত, এই "সব মানুষই সমান"—বামপন্থীদের এই প্রচার বহু মানুষকে বামপন্থার দিকে টেনে আনে, কিন্তু এই কথায় বামপন্থীদের মতো এত অবিশ্বাস আর কেউ করে না। বামপন্থী রাজনৈতিক ব্যবস্থার যে কোনো মানুষের অতএব চেষ্টা এই ব্যতিক্রমী স্তরে পৌঁছানো, এবং এর জন্য বামপন্থীরা যে পন্থা অবলম্বন করে তা যেমনি নিষ্ঠুর ও অমানবিক তেমনি হৃদয়বিদারক।

** জর্জ অরওয়েলের আসল নাম এরিক ব্লেয়ার, বিহারের মতিহারিতে জন্ম, জগদ্বিখ্যাত ইংরাজ লেখক। প্রখ্যাততম উপন্যাসের নাম '১৯৮৪'। কমিউনিজমের মানবতা-বিরোধী স্বভাব এই লেখক বিশ্বের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন।*

তিনজন প্রথম সারির আন্তর্জাতিক বামপন্থী নেতার কথা ধরা যাক— স্তালিন, মাও জেদঙ ও পল পত্। লেনিনের মৃত্যুর পরে (মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধেও স্তালিনের হাত আছে এমন সন্দেহ করা হয়ে থাকে) নিজের আসন নিষ্কন্টক করার জন্য স্তালিন নিজের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী কিরভ, বুখারিন, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, ফন বক্ ইত্যাদি সকলকে নির্মমভাবে খুন করেছে, ট্রটস্কিকে প্রথমে নির্বাসনে পাঠিয়ে তারপর এক আততায়ী পাঠিয়ে গাঁইতি দিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে খুন করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন যে পোলিশ সৈন্যদল নাৎসিবাহিনীর তাড়ায় সোভিয়েট ইউনিয়নে এসে আশ্রয় নিয়েছিল সেই পোলিশ বাহিনীর তাবৎ অফিসারবর্গকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করিয়েছে (যার নাম কাটিন ফরেস্ট ম্যাসাকার)—যাতে যুদ্ধোত্তরকালে পোল্যাণ্ড দখল নিষ্কন্টক হয়। আমাদের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্রও সম্ভবত স্তালিনের হাতে খুন হয়েছেন। মাও জেদঙ যখন 'সামনের দিকে বিরাট লাফ' ইত্যাদি পরিকল্পনায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয় তখন দলের মধ্যে তাঁর অত্যন্ত কোণঠাসা অবস্থা হয়। এই অবস্থা থেকে বেরোবার জন্য মাও জেদঙ এক অপূর্ব পরিকল্পনা ফাঁদল, যার নাম সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব সফল করবার জন্য মাওয়ের আদেশে কোটি কোটি স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী পড়াশুনো ছেড়ে 'গাঁয়ে কাজ করবার জন্য এবং শ্রেণীশত্রু খতম করবার জন্য' বেরিয়ে পড়ল। এইসব লাল রুমাল বাঁধা রেডগার্ডরা বিপ্লবের চিল-চিৎকারে এতদূর প্ররোচিত হয়েছিল যে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে তারা শ্রেণীশত্রু নাম দিয়ে হত্যা করেছিল তো বটেই, শোনা যায় এক প্রাক্তন জমিদারের নাতিকে হত্যা করে তার মাংস পর্যন্ত খেয়েছিল। এইসময় মাওয়ের প্রাক্তন সহকর্মীরা, যাঁরা এই ধরনের বাড়াবাড়ির বিরোধী ছিলেন, যেমন লিউ-শাও-চি, পেঙচেন, এমনকি জু এন-লাই চরম হেনস্থা হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মাও নিজের এই সময়কার এক নম্বর সহকর্মী লিন পিয়াওকেও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হত্যা করিয়েছিল। কাম্বোডিয়ার, খ্মের

রুজ বা 'লাল কাম্বোডিয়া' বাহিনীর সেনানায়ক পল পতের কীর্তি আরো হৃদয়বিদারক। আন্দাজ করা হয়ে থাকে যে নিজের রাজত্বকালে পল পত প্রায় দশ লক্ষ স্বজাতীয়কে হত্যা করেছিল—তাদের একমাত্র অপরাধ, তারা কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা রাখত, কারণ তারা ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, অধ্যাপক, শিক্ষক ইত্যাদি পেশায় রত ছিল। পল পতের স্বপ্ন ছিল প্রতি বামপন্থীর স্বপ্ন—অর্থাৎ দেশ ফিরে যাবে এমন এক অবস্থায় যেখানে দিন এনে দিন খাওয়ার মতো কৃষক ছাড়া আর কেউ থাকবে না, থাকবে শুধু এক ব্যতিক্রমী গোষ্ঠী, যারা দেশ শাসন করবে। মাও-ও এজন্য পল পতকে সাধুবাদও দিয়েছিল। আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি-বামপন্থী দল বা গোষ্ঠী এই নরপিশাচদের কাজের কোনো প্রতিবাদ করেনি।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্কুলের পাঠক্রম থেকে ইংরাজি ও পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া কি পল পতের গণহত্যার এক জলে গোলা অনুকরণ? যাতে করে সাধারণ বাঙালি ছেলেদের লেখাপড়া পার্টির মুখপত্র পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে? অসম্ভব নয়। কিন্তু বাঙালি-বামপন্থীদের সবচেয়ে অমানবিক কাজ নিঃসন্দেহে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে, যখন দেশভাগের সম্ভাবনা ধূমায়িত হচ্ছে, সে সময় কমিউনিস্ট পার্টি মুসলিম লিগের দেশভাগের দাবিকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল। এইসময়ই কমিউনিস্ট পার্টি তার গঙ্গাধর অধিকারী কৃত 'অধিকারী থিসিস' অনুমোদন করে বাজারে ছাড়ে, যার প্রতিপাদ্য ছিল ''ভারতীয় কোনো জাতি নয়, ভারত আঠারোটি জাতিগোষ্ঠীর সমষ্টি'। ***দেশভাগ প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদের শ্লোগান ছিল 'পাকিস্তান মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে'।*** এর সম্ভবত উদ্দেশ্য ছিল এই ঃ যেহেতু বর্তমানে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামে জ্ঞাত ভূখণ্ডে এই সময় মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় পশ্চাদপদ ছিল সেজন্য পাকিস্তান সমর্থন করলে সেই পশ্চাদপদ মুসলমানদের সমর্থন পাওয়া যাবে এবং তাদের ওপর রাজত্ব

করা যাবে। দেশ ভাগ হবার পর দেখা গেল তা হবার নয়, ইসলাম মার্কসবাদের তোয়াক্কা করে না। (এটা পরেও দেখা গেছে ইন্দোনেশিয়ায়, যেখানে মোল্লাদের নেতৃত্বে এক বিদ্রোহে ইন্দোনেশিয়ার তাবৎ কমিউনিস্টকে রাতারাতি হত্যা করা হয়েছিল; আফগানিস্তানে, যেখানে কমিউনিস্ট শাসক নাজিবুল্লাকে তিনদিন প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।) এরপরে যত পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু কমিউনিস্ট ছিলেন (যথা প্রমোদ দাশগুপ্ত, প্রশান্ত শূর ইত্যাদি) সবাই পূর্ব-পাকিস্তানি মুসলমানদের অত্যাচারে ঘরবাড়ি ফেলে পিটটান দিলেন এবং এই পোড়া পশ্চিমবঙ্গে বসত করলেন। তখন জওহরলাল নেহেরু ও পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্নার নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর নানাভাবে পূর্ববঙ্গাগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের জঘন্য বঞ্চনা করেছিল, যার প্রতিবাদে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রমুখ পূর্ববঙ্গাগত বামপন্থীরা এই বঞ্চনার সুযোগ নিয়ে উদ্বাস্তুদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট ও সফল হলেন। আজকে যে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গদিয়ান তার গোড়াপত্তন হয় সেই সময়ের উদ্বাস্তু ক্যাম্প ও কলোনিগুলিতে।

এই সময় পশ্চিমবঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। ডাঃ রায় চেষ্টা করেছিলেন পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পুনর্বাসন করতে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের জলবায়ুর সঙ্গে পূর্ববঙ্গেব জলবায়ুর প্রচুর মিল থাকায় এ সময় এই উদ্বাস্তুরা অনায়াসেই পুনর্বাসিত হতে পারত, এবং পরবর্তীকালে সুখস্বচ্ছন্দে থাকতে পারত। কিন্তু বামপন্থীরা বাদ সাধল এবং বিরাট বিক্ষোভ চালু করে দিল এই দাবি নিয়ে, যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গেই পুনর্বাসন দিতে হবে। ইতিমধ্যে আন্দামানে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে কিছু কায়েমি স্বার্থ সচেষ্ট ছিল, তার মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্নাও ছিলেন।

যখন বামপন্থীরা আন্দামানে উদ্বাস্তুদের যাওয়ার বাধা সৃষ্টি করল তখন এই স্বার্থান্বেষী মহল বলল যে বাঙালিরাই যখন আপত্তি করছে তখন আন্দামানে উদ্বাস্তুদের এনে দরকার নেই। ফলে আন্দামানে আর উদ্বাস্তু যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। যেসব উদ্বাস্তু নিজের চেষ্টায় পুনর্বাসিত হতে পারলেন না তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে নানা ক্যাম্পে অত্যন্ত দীনভাবে, 'ক্যাশ ডোল' নামক সরকারি ভিক্ষার ওপর নির্ভর করে জীবনযাপন করতে বাধ্য হলেন। ইতিমধ্যে বামপন্থীরা সুকৌশলে রটাল যে এই অবস্থার জন্য কংগ্রেস সরকারই দায়ী এবং এইভাবেই বামপন্থীরা নিজেদের প্রভাব আরো বিস্তার করল।

উনিশশো ষাট সালের কাছাকাছি সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত করল যে পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত উদ্বাস্তু ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলা হবে, ক্যাশ ডোল বন্ধ করে দেওয়া হবে, এবং উদ্বাস্তুদের ওড়িশা-মধ্যপ্রদেশ সীমান্তে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন করা হবে। এইসময় পর্যন্ত প্রত্যেক দুবছর অন্তর পূর্ব পাকিস্তান সরকার সুপরিকল্পিতভাবে দাঙ্গা লাগাচ্ছিল এবং হিন্দু বিতাড়ণ করছিল। কিন্তু যদিও কমিউনিস্টরা এ সময় উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছিল, তারা কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় সংখ্যালঘু হিন্দুর ওপর সংখ্যাগুরু মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে টু শব্দও করেনি (কংগ্রেসও করেনি)। এই বিষয়ে প্রতিবাদ করতে পারতেন শুধু দুজন—ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহা (নিজে উদ্বাস্তু), কিন্তু এঁরা দুজনেই অকালমৃত। যে সময় কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত করল ততদিনে উদ্বাস্তুদের মধ্যে বামপন্থীরা পাকা জায়গা করে নিয়েছে। ফলে তারা উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার বিরুদ্ধে কিছু লোকদেখানো হৈ চৈ ছাড়া আর বিশেষ কিছু করল না, এবং সেই বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্যের মতো ঊষর জায়গায় গিয়ে বহু কষ্ট-স্বীকার করে বসতিস্থাপন করতে বাধ্য হল।

আরো বেশ কিছু বছর পর, ১৯৭৮ সালে এই উদ্বাস্তুদের একটি বড়

অংশ (প্রায় সবাই অনুসূচিত জাতিভুক্ত) সমস্ত ঘরবাড়ি ছেড়ে নিজের সব অস্থাবর সম্পত্তি জলের দামে বিক্রি করে, দল বেঁধে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে, এবং সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি নামক এক দ্বীপে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপনের তোড়জোড় করে। এই সময় পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার গদিতে বসে গেছে, এবং কেন্দ্রে মোরারজি দেশাইয়ের নেতৃত্বে জনতা পার্টির সরকার। তখন আর বামপন্থীদের উদ্বাস্তু সমর্থনের কোনো প্রয়োজন নেই, বরঞ্চ জঙ্গল কেটে পরিবেশ ধ্বংস করার অপবাদ যাতে গায়ে না লাগে সেজন্য সরকার সচেষ্ট। অতএব জ্যোতি বসুর সরকার, পুলিশ এবং পার্টির ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীকে পাঠিয়ে তাবৎ উদ্বাস্তুকে মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত করে দিল। উদ্বাস্তুদের কিছু গুলি খেয়ে মরল, কিছু জলে পড়ে কুমিরের পেটে গেল, আর বাকিরা সর্বসান্ত হয়ে আবার ট্রেনে বোঝাই করে দন্ডাকারণ্যে ফেরত গেল। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা কিন্তু কিছু চায়নি, না ঘরবাড়ি, না ক্যাশ ডোল, শুধু পশ্চিমবঙ্গে একটু থাকবার জায়গা চেয়েছিল। তাও পেল না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে এর মর্মন্তুদ বর্ণনা আছে।

অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াল এই: যে বাঙালি-বামপন্থীরা (যাদের নিজেরা অনেকেই উদ্বাস্তু) শুধু রাজনৈতিক ফায়দার জন্য, পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দিতে হবে দাবি করে উদ্বাস্তুদের আন্দামানে যেতে দিল না, সেই বাঙালি-বামপন্থীরাই মরিচঝাঁপি থেকে পশ্চিমবঙ্গে-পুনর্বাসনেচ্ছু উদ্বাস্তুদের কুকুরের মতো খেদাল। এমন কাজ শুধু বামপন্থীরাই পারে; কারণ এদের কাছে উদ্বাস্তুরা একটি ক্ষমতা লাভের সোপান মাত্র, ক্ষমতা পেয়ে গেলে তার দরকার নেই। উদ্বাস্তুদের কল্যাণও বামপন্থীদের উদ্দেশ্য নয়, কখনোই ছিল না। বিবেক, মানবতা, সহানুভূতি-বামপন্থায় কিছুরই জায়গা নেই—ক্ষমতা দখল ও কায়েম রাখাই একমাত্র লক্ষ্য।

বামপন্থীদের অমানবিকতার আরও পরিচয় পাওয়া যায় অন্যান্য

জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তাদের মনোভাবে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত তাদের পরিষ্কার মনোভাব হচ্ছে "আমরা মানুষের জন্য কিছু করতে পারি-না পারি, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে কিছু করতে দেব না।" এটা বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে প্রযোজ্য, কলকাতা শহরে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। এর চরম প্রকাশ দেখা গিয়েছিল কিছু বছর আগে পূর্ব-কলকাতার বাগমারি অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডের ত্রাণব্যবস্থায়, ইদানীং দেখা গেছে মেদিনীপুর জেলার দাঁতন অঞ্চলের ত্রাণে, দেখা গেছে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত স্কুলগুলিতে নিজেদের চামচা দলবাজ কিছু শিক্ষক নামধারী খুদে রাজনীতিকের অনুপ্রবেশে। ত্রাণব্যবস্থার সরকারি হালচাল সকলেরই জানা আছে। অপরপক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ নিজেদের নিষ্ঠাবান্ কর্মী নিয়ে এ ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এ কথাও সকলেরই জানা। "ওদের সুনাম হলে আমাদের বদনাম" এই নীতি নিয়ে সরকার তথা আঞ্চলিক প্রশাসন অর্থাৎ জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি প্রাণপণ চেষ্টা করেছে ত্রাণব্যবস্থা যেই করুক বিলি যেন বামপন্থীদের হাত দিয়ে হয়। যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে তারা ত্রাণব্যবস্থাতেই বাধা দিয়েছে। সরকারি স্কুলে লেখাপড়া হয় না, অপরপক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলগুলি উৎকর্ষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—এই ব্যাপারটিতে বাঙালি-বামপন্থীদের বহুকাল চুলকোচ্ছিল। ইদানীং কিছু শিক্ষক নামধারী দলবাজ দাবি তুলেছে স্কুল পরিচালনার ভার কেন শুধু সাধুদের ওপর থাকবে দলবাজদেরও (অর্থাৎ অসাধুদেরও) সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু এই নীতি কলকাতায় প্রযোজ্য নয়, কারণ মন্ত্রী তথা পার্টির নেতাদের সন্তানদের তো সুশিক্ষা ও সুচিকিৎসা পেতে হবে। তাই এখানে পূতিগন্ধময় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশে সুপরিচালিত রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাপ্রতিষ্ঠান ও বিলাসবহুল বেলভিউ নার্সিং হোম অবাধে চলে। পঙ্গু সরকারি স্কুলের পাশেই বিরাজমান মিশনের নরেন্দ্রপুর, খ্রিস্টান মিশনারি

পরিচালিত প্রচুর প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বস্তুত বামপন্থার অমানবিকতার আসল প্রকাশ "দলং কেবলং" নীতিতে। সি পি আই (এম) দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠিতা মুজফ্ফর আমেদ ওরফে 'কাকাবাবু' তো বলেই দিয়েছিলেন 'বন্ধুর চেয়ে পার্টি বড়'। কিন্তু পুরোটা খোলসা করে বলেননি। শুধু বন্ধুর চেয়ে নয়, স্ত্রী পুত্র, কন্যা পরিজন, পিতা, মাতা, দয়া, মায়া, ধর্ম, অধর্ম, উচিত, অনুচিত, সত্য-মিথ্যা সব কিছুর চেয়েই পার্টি বড়। এই পার্টি কি? না, কিছু ক্ষমতালোলুপ মানুষের একত্র সংযোজন! যে পন্থার ধারণা, যে মানুষের মধ্যে যা শাশ্বত তার চেয়ে এইরকম কিছু ক্ষমতালোলুপ মানুষের রাজত্ব বড়, সে পন্থার চেয়ে অমানবিক আর বিশ্বে কি হতে পারে?

বামপন্থীরা প্রায়ই নিজেদের 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী' বলে জাহির করে থাকে। এই ফ্যাসিবাদ একটি একনায়কতন্ত্রী উগ্র জাতীয়তাবাদী মতবাদ যার জনক যুদ্ধপূর্ব ইটালির একনায়ক মুসোলিনি। যুদ্ধোত্তর বিশ্বে ফ্যাসিবাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু যেহেতু বামপন্থীদের সর্বদাই লড়বার জন্য এবং লোক খ্যাপাবার জন্য একটা জুজু দরকার সেজন্য মাঝে মাঝেই বামপন্থীরা 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী' হৈ চৈ করে। বস্তুত অমানবিকতার দিক্ দিয়ে লেনিনবাদ ও ফ্যাসিবাদে বিন্দুমাত্র তফাত নেই, একটি বিশেষ পদার্থের এপিঠ আর ওপিঠের মতো। ফ্যাসিবাদী হিটলার-মুসোলিনি-ফ্রাংকো যেমন তাদের বিরোধীদের নির্বিচারে খুন করেছে, জেলে ভরেছে, অকথ্য অত্যাচার করেছে, তেমনি লেনিনবাদী স্তালিন-মাও-পলপত্ও তাদের বিরোধীদের নির্বিচারে খুন করেছে, জেলে ভরেছে, অকথ্য অত্যাচার করেছে। বামপন্থীদের ফ্যাসিবিরোধিতা তাই 'চোরের মায়ের বড় গলা'-র আরো একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চার ঃ মানুষে-মানুষে হিংসা সৃষ্টি

তৃতীয় কারণ ঃ বামপন্থা পরিত্যাজ্য, কারণ বামপন্থা মানুষে-মানুষে হিংসা সৃষ্টি করা এবং জিইয়ে রাখায় বিশ্বাস করে।

বামপন্থার শুরু শ্রেণীবৈষম্য দিয়ে এবং শেষ শ্রেণীহীন সমাজ কায়েম করা দিয়ে। কিন্তু এসব নেহাত কেতাবি কথা। আগরতলায় মাণিক সরকার থেকে হাভানার ফিদেল কাস্ত্রো পর্যন্ত সবাই জানেন শ্রেণীহীন সমাজ কোনো দিন হবে না। তা হলে কি হবে? শ্রেণী সংগ্রাম হবে, শ্রেণী সংঘর্ষ হবে। শ্রেণী কি রকম, কিসের ভিত্তিতে শ্রেণী? না, শুধু অর্থনৈতিক ভিত্তিতে। মানুষ বামপন্থার দৃষ্টিতে শুধু অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত, বুর্জোয়া-ভূস্বামী শ্রেণী, পাতি বুর্জোয়া, শোষক শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণী, 'কুলাক' শ্রেণী ইত্যাদি। অথবা, আরো সরলীকরণ করে, শোষক ও শোষিত শ্রেণী। প্রতি শ্রেণীর-সাথে অন্য শ্রেণীর তীব্র লড়াই শুরু করতে হবে এবং চালু রাখতে হবে।

সমস্তটাই গোঁজামিল, কারণ মানুষ অত্যন্ত জটিল প্রাণী, শুধু অর্থনৈতিক ভিত্তিতে তাকে শ্রেণীবিভাগ কখনোই করা যায় না। শুধু গোঁজামিল নয়, বামপন্থীরা জানে এটা গোঁজামিল, অতএব এটা ভণ্ডামিও। এই ভণ্ডামি বামপন্থায় ওতপ্রোত হয়ে আছে, যে জন্য বামপন্থার আলোচনায় প্রথমেই ভণ্ডামির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ যে কত বড় গোঁজামিল তার সর্বপ্রথম প্রমাণ, আজ পর্যন্ত মানবজাতির ইতিহাসে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাজনের ভিত্তিতে অল্প কয়েকটির বেশি কোনো যুদ্ধবিগ্রহ হয়নি। যা হয়েছে তা হয় জাতীয়তার ভিত্তিতে, নয় ভাষার ভিত্তিতে, নয় ধর্মের ভিত্তিতে। এবং যখন এইসব যুদ্ধ বা বিদ্রোহ হয়েছে তখন অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ ভুলে সব মানুষ জাতি, ভাষা বা ধর্মের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। এই গোঁজামিলটা বামপন্থীরা ব্যাখ্যা করতে

চেষ্টা করে এইভাবে, যে আপাতদৃষ্টিতে জাতি, ভাষা বা ধর্মের ভিত্তিতে যুদ্ধ হলেও আসল কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক, অতএব প্রচ্ছন্নভাবে অর্থনৈতিক কারণেই যুদ্ধ হয়েছে। এটা ডাহা বাজে কথা। খুব ঘরের কাছের উদাহরণ দেওয়া যাক্। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে যখন পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু বিতাড়ণ হয়েছিল তখন কিন্তু মুসলমান জমিদার ও মুসলমান চাষি দুদল মিলে হিন্দু জমিদার ও হিন্দু চাষিকে ঘরছাড়া করেছিল। এখনও যে বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের ওপর অত্যাচার হয় তাতে সমতল থেকে আসা গরিব মুসলমান চাষি পর্বতের গরিব বৌদ্ধ চাকমা চাষিকে উৎখাত করে। যদি বলা হয় যে ইংরাজ, বা বাংলাদেশের মুসলিম জমিদার শ্রেণী গরিব মুসলিমকে প্ররোচিত করেছে গরিব হিন্দুকে হত্যা এবং উৎখাত করার জন্য, তা হলে জিজ্ঞাসা করতে হয়, সেইসব গরিব মুসলিমের ভুল পঞ্চাশ বছরেও কেন ভাঙল না ? এছাড়া জাতিতে জাতিতে লড়াইয়ের উদাহরণ অজস্র, লড়াই হয়েছে হিন্দু মুসলমানে, মুসলমান খ্রিস্টানে, মুসলমান শিখে, মুসলমানে ইহুদিতে, ক্যাথলিক প্রটেস্ট্যান্টে। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে লড়াইয়ের শুধু কয়েকটি উদাহরণ মনে পড়ছে ঃ এক, ফরাসি বিপ্লব, দুই, রুশ বিপ্লব, যদিও তার আরব্ধ ফল এখন আর নেই, তিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ, যা ক্রীতদাস প্রথা ও তুলো চাষের ব্যাপারে হয়েছিল। চার, চিনের 'মুক্তিযুদ্ধ', যার ফলে মাও জেদঙ্ ক্ষমতায় আসেন, যদিও চিনের যুদ্ধের ব্যাপারে আরো বহু বিষয় জড়িত ছিল, নিছক অর্থনৈতিক যুদ্ধ এটা ছিল না। মানুষকে শুধু অর্থনৈতিক শ্রেণীতে ভাগ করা, বা শুধু শোষক ও শোষিতের মধ্যে ভাগ করা এক অতি হাস্যকর অতিসরলীকরণ। এ যেন বলা যে মানবজাতির দুইভাগে বিভক্ত ঃ লম্বা ও বেঁটে। এটি যতটা হাস্যকর, শোষক-শোষিত বিভাজনও তাই।

'বিপ্লব' কথাটা বাঙালি বামপন্থীদের মুখে আগে অহরহ শোনা যেত, এখনও অল্পস্বল্প শোনা যায়। আরো শোনা যায়, বিপ্লব নাকি 'অনিবার্য'

এবং 'দীর্ঘজীবী'। বস্তুত বাঁধা বামপন্থী স্লোগান 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' একটি উর্দু বাক্যাংশ, এর মানে 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্'। এখন প্রশ্ন, কী এই বিপ্লব নামক পদার্থ? এ প্রসঙ্গে সত্তরের দশকে লেখা নকশালদের একটি ইস্তাহার স্মরণ করা যেতে পারে : ''বিপ্লব কোনো ভোজসভা, বক্তৃতা, প্রবন্ধ রচনা বা সূচিকর্ম নয়। বিপ্লব হচ্ছে একটি উগ্র বলপ্রয়োগের কাজ যার দ্বারা একটি শ্রেণী অপর একটি শ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে''। যদি ধরে নেওয়া যায় এটিই সঠিক মার্কসবাদী বা বামপন্থী বিপ্লবের সংজ্ঞা তা হলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে কেন উৎখাত করতে হবে। যদি, তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায়, মনুষ্যজাতি এরকম শ্রেণীবিভক্তও হয়, তা হলেও কেন বিভিন্ন শ্রেণী হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারবে না? উৎখাত কেন করতে হবে? এর কোনো উত্তর বামপন্থীদের হাতে নেই, একমাত্র বক্তব্য মার্কসবাবার কেতাবে এই লেখা আছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন : বিপ্লব 'দীর্ঘজীবী'ই বা কি রকম কথা? তার মানে কি সারাজীবন লাঠালাঠি করে যেতে হবে কখনোই সুস্থির হয়ে বসা যাবে না?

মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই যে, এভাবে শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভাগাভাগি এবং লাঠালাঠি কখনো টেকেনি, সব মিলিয়ে গুলিয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ লাঠালাঠি চায় না, 'লাগাতার সংগ্রাম', 'লড়াই লড়াই' ইত্যাদি চায় না, স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকতে চায়। এবং সোজা কথায়, এরই ফলে বিপ্লব অসম্ভব। শোষক-শোষিত ব্যাপারটা কিরকম গুলিয়ে গেছে তার একটু উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে। যিনি কারখানার গেটে মিটিং করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে বিপ্লবের পথে চলতে এইমাত্র প্রবুদ্ধ করে এলেন তিনি বাড়ি ফিরেই কাজের লোকটিকে বললেন রবিবার ছুটি নিলে মাইনে কেটে নেব। সর্বহারার মহান্ নেতা জ্যোতি বসু যখন অনাবাসী ভারতীয় শিল্পপতি ধরে আনার ছলে সরকারি খরচে নিজের চিকিৎসা করাতে বিলেতে যান তখন তার টাকা কোথা থেকে

আসে? আসে গরিব আমজনতার পকেট থেকেই। এবার বিচার্য, কে শোষক, কে শোষিত, বিপ্লবই বা কে করবে?

বামপন্থীদের ক্ষমতা কায়েম করার অন্যতম কৌশল হচ্ছে মানুষকে সর্বদা কোনো না কোনো উত্তেজনার মধ্যে রাখা, যাতে মানুষ ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে না পারে। এই উত্তেজনার নানা রকম উপায় আছে, যথা মিটিং, মিছিল, অবস্থান, অবরোধ, বন্‌ধ, রাস্তা রোকো ইত্যাদি। লক্ষণীয়, প্রতিটিই নেতিবাচক, অর্থাৎ প্রতিটিই সাধারণ জীবনযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়। এইসব উত্তেজনাকর পন্থার মধ্যে একটি জিনিস সাধারণত দেখা যায়, যা হচ্ছে একটি কাল্পনিক জুজু খাড়া করে তার বিরুদ্ধে চেল্লানো। এই জুজুর মধ্যে অগ্রগণ্য অবশ্যই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, কারণ এ অতি নিরাপদ, বাঙালি-বামপন্থীরা যদি রঘুনাথপুর বা বেথুয়াডহরিতে বসে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গলা ফাটায় তবে মার্কিনরা টেরও পাবে না, কোনোরকম প্রতিবাদও করবে না। আর একটি জুজু 'ফ্যাসিবাদ', এর কথা আগেই বলা হয়েছে। আর একটি ছিল 'কেন্দ্রের বঞ্চনা'। এখন বামপন্থীরা এই স্লোগানটি খানিকটা গুটিয়ে নিয়েছে; কারণ বহুব্যবহারে এটি এত জীর্ণ যে লোকে বলতে আরম্ভ করেছে, 'সব দোষ কেন্দ্রের আর তোমরা ধোয়া তুলসীপাতা।' সত্তরের এবং আশির দশকের গোড়ার দিকে প্রচন্ড লোড—শেডিং চলছিল তখন বামপন্থীরা বিদ্যুৎহীন গ্রামাঞ্চলে বলে বেড়াত যে, শ্রেণীশত্রু অর্থাৎ কলকাতার বড়লোকদের রতের ঘুম কেড়ে নেবার ব্যবস্থা তারা করেছে। ভুলে যেত যে বড়লোকদের জেনারেটার আছে, ঘুম চলে গেছে গরিব-মধ্যবিত্তদের। পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে মানুষকে তাতিয়ে রাখার ব্যবস্থা। যে কোনো একটা জুজু খাড়া করে বলা, ওই দেখো, ওই তোমার শ্রেণীশত্রু! ওকে পেটাও, না পারলে ঢিল মারো, তাও না পারলে মিছিল বার করে প্রতিবাদ কর, নিজেদের অঞ্চলের মধ্যে ট্রেন-বাস বন্ধ করে দাও। আমরা তোমার পাশে আছি, ঢিল এবং লাল শালু ক্রমাগত সাপ্লাই করে যাবে।

পাঁচ ঃ গণতন্ত্র-বিরোধী, অবৈজ্ঞানিক বামপন্থা

চতুর্থ কারণ ঃ বামপন্থা পরিত্যাজ্য, কারণ বামপন্থা অগণতান্ত্রিক, অবৈজ্ঞানিক।

এই কারণটি শুনে বেশ কিছু বামপন্থা-বিরোধীও চমকে যেতে পারেন। কারণ যে কোনো বামপন্থী সংগঠকের সঙ্গেই গণ বা গণতন্ত্রী শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়। যেমন, বামপন্থীদের সব জায়গায় দলবাজি করবার যন্ত্রের নাম গণসংগঠন, শিক্ষাজগতে বামপন্থীদের ঢুকবার প্রচেষ্টার নাম গণতন্ত্রীকরণ। তেমনি বৈজ্ঞানিকতার ব্যাপারে কিছুদিন আগে দেয়ালে লেনিনের ছবির নিচে একটি উদ্ধৃতি দেখা যেত ঃ 'মার্কসবাদ কোনো আপ্তবাক্য নয়, বিজ্ঞান'। যে দল ক্রমাগত এইভাবে নিজেদের গণতন্ত্রী ও বৈজ্ঞানিক বলে জাহির করতে পারে তাদের মতাদর্শ কি কখনো অগণতান্ত্রিক বা অবৈজ্ঞানিক হতে পারে?

পারে নায়, হয়েছে। এবং জাহির করার ব্যাপারটা, আবার, চোরের মায়ের বড় গলা।

আগেই বলা হয়েছে বামপন্থী দলগুলির পরিচালনা ব্যবস্থার গোড়ার কথা হচ্ছে ডেমোক্র্যাটিক সেন্ট্রালিজ্‌ম, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বা দলের ওপরমহলের নির্দেশে নিচুমহলের কোনো প্রশ্ন না করে চলা। এটা তো 'কেন্দ্রিকতা', তা হলে 'গণতান্ত্রিক' কোন জিনিসটা? উত্তর, কিছু না। কেতাবে অবশ্য লেখা আছে নেতারা সবাই লোকাল কমিটি, ব্রাঞ্চ কমিটি ইত্যাদির মারফত উঠে আসবেন, এবং কমিটির ভেতরকার নেতারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হবেন। কাজে সাধারণত যা হয় তা হল ওপরমহল থেকে একটি 'প্যানেল' দিয়ে দেওয়া হয়, এবং কমিটির সভ্যরা তার ওপর নিজেদের স্বীকৃতির রবার স্ট্যাম্প মেরে দেন। ইদানীং ক্ষমতার চাহিদা খুব বেড়ে যাওয়ায় অনেক জায়গায় এটা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে

ভোটাভুটি হচ্ছে, কিন্তু এগুলি এখনো ব্যতিক্রম। যেমন, সব নিয়মের ব্যতিক্রম ওপরমহলের নেতারা, যাদের জর্জ অরওয়েল বলেছিলেন, 'মোর ইকুয়েল দ্যান আদার্স'।

মোদ্দা কথা হচ্ছে এই ঃ বামপন্থী পার্টিতে প্রতিবাদের, প্রশ্ন করার কোনো জায়গা নেই। পার্টি থেকে যা নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হবে তাতে যদি নিজের মাকে খুন করার কথাও থাকে, তা অম্লানবদনে করে এসে বলতে হবে, "কমরেড, আশা করি, আমি আমার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছি।" প্রশ্ন করার নাম বিচ্যুতি, প্রতিবাদ করলে আগে খুন করা হত, এখন পার্টি থেকে বার করে দেওয়া হয়। ধোপা নাপিত বন্ধ করে দেওয়া হয়, হাতে না মেরে ভাতে মারা হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার শেষ দিকে এই ধরনের লোককে পাগল প্রমাণ করে গারদে ভরে রাখার চেষ্টা করা হত।

এই যদি পার্টির ভেতরের চেহারা হয় তবে বাইরের চেহারা কী? গ্রামবাংলার মানুষের ভালই জানা আছে, পার্টি কিভাবে সরকারি প্রশাসন যন্ত্রকে নিজের কাজে নিয়োগ করে তাকে একটা শাখাকেন্দ্র বানিয়ে দিয়েছে। গ্রামবাংলার বহু জায়গায় এল. সি. এস বা লোকাল কমিটির সেক্রেটারির সুপারিশ না নিয়ে এলে থানায় ডায়েরি নেয় না, হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়া যায় না। আমাদের গণতন্ত্রীয় ব্যবস্থার অন্যতম গোড়ার কথা হচ্ছে যে প্রশাসন যন্ত্র হবে রাজনীতি-নিরপেক্ষ; অর্থাৎ একজন বিরোধী দলের সমর্থক বা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক মানুষের প্রশাসনের কাছে সুবিচার পাবার ততটাই অধিকার, যতটা একজন ক্ষমতাসীন পার্টির সমর্থকের আছে। এই ব্যবস্থাটাকে বামফ্রন্ট সরকার পুরো উল্টে দিয়েছে। এটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া ও বর্তমান চিনেও একই ব্যবস্থা, কমিউনিস্টবিরোধী কোনো পার্টির কোনো জায়গা নেই। সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ করারও কোনো জায়গা

নেই। লেনিন নিজেই বলেছেন, পার্লামেন্ট হচ্ছে শুয়োরের খোঁয়াড়, কায়েম করতে হবে সর্বহারার একনায়কত্ব (পড়ুন, পার্টির একচ্ছত্র ক্ষমতা)। যে দল বা মতাদর্শ নিজেদের কর্তৃত্বাধীন দেশের সাধারণ মানুষকে প্রতিবাদ করার অধিকার পর্যন্ত দেয় না, সে দল নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে কোন্ সুবাদে?

বলে, কারণ চোরের মায়ের বড় গলা। বামপন্থা চরম গণতন্ত্রবিরোধী, এই সত্যকে ঢাকবার জন্য বামপন্থীরা ঘুমোতে যাবার সময় বলে গণঘুম পেয়েছে, সঙ্গীর কাশি হলে বলে কমরেড. গণকাশি হয়েছে দেখছি। এমনি সুদূরপ্রসারী বাঙালি বামপন্থীদের গণমিথ্যাচার।

বামপন্থা অবৈজ্ঞানিক কেন? প্রথমে বোঝা দরকার বিজ্ঞান কি? বিজ্ঞান একটি যুক্তিনির্ভর ও পরীক্ষানির্ভর শাস্ত্র। বিজ্ঞানী যদি কোনো মত পোষণ করেন, এবং পরবর্তীকালে পরীক্ষায় প্রমাণ হয় সেই মত ভুল, তবে বিজ্ঞানীকে বিনা দ্বিধায় পূর্বমত ফেলে দিতে হবে। যেমন, বিজ্ঞানী নিউটনের মত ছিল আলো সোজা পথে চলে, পরে বিজ্ঞানী হাইগেন্স দেখালেন, না আলো তরঙ্গকারে চলে, তারও পরে বিজ্ঞানী প্লাংক দেখালেন আলো একঝাঁক ছোড়া ঢিলের মতো করে চলে। প্রতিক্ষেত্রে পরবর্তী মত পূর্ববর্তী মতকে উৎখাত করেছে। বামপন্থা তথা মার্কসবাদ কি এ রকম পরীক্ষায় টিকতে পেরেছে? যে বিশাল, মহাপরাক্রমশালী সোভিয়েত ইউনিয়ন এক সময় বিশ্বের তাবৎ কমিউনিজ্‌মের মাতৃভূমি ছিল তা আজ ফুৎকারে মিলিয়ে গেছে, টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ গোটা পূর্ব ইউরোপ, অর্থাৎ পূর্ব জার্মানি, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়ায় মার্কসবাদ, কমিউনিজ্‌ম, বামপন্থা, ডাহা ফেল মেরেছে। দেঙ্ জিয়াঙ পিঙ্-এর চিনে যা চলেছে তাতে কমিউনিজ্‌মের জবরদস্তিটাই কেবল আছে, মার্কসবাদী মতাদর্শ ও অর্থনীতি কিছুই নেই। যে তত্ত্ব এত

দেশে ফেল মেরে গেল সে তত্ত্ব কি করে বৈজ্ঞানিক হতে পারে? কিন্তু না, বাঙালি-বামপন্থীরা বলে, এখনকার মত ফেল মেরেছে বটে, কিন্তু উঠে দাঁড়াতে কতক্ষণ? এটা কি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা? অবশ্যই নয়।

মার্কসবাদ বা বামপন্থা অযৌক্তিক, কারণ এই তত্ত্বে মনে করা হয় যে খেতে-পরতে পেলেই মানুষ খুশি, আহার-নিদ্রা-মৈথুনের বেশি আর কারো কিছু চাইবার থাকতে পারে না। এই তত্ত্ব মানবচরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। যে না খেতে পেয়ে একেবারে মরে যাচ্ছে সে হয়তো খেতে পেলেই তুষ্ট, কিন্তু একবার চিন্তা করতে বসলেই সে বামপন্থা মেনে নিতে পারে না। সেইজন্য যারা গোড়া থেকেই স্থির সিদ্ধান্ত করে নিয়েছে যে বামপন্থা সঠিক তারা মানুষের চিন্তা করার অধিকারটাই কেড়ে নিতে চায়, যার চরম প্রকাশ হয়েছিল পূর্বোক্ত কাম্বোডিয়ার সেনানায়ক-কাম্-নরপিশাচ পল পতের মধ্যে।

ছয় ঃ জাতীয়তা ও ধর্মবিরোধী বামপন্থা

মার্কসবাদ তথা বামপন্থা পরিত্যাজ্য হবার পঞ্চম কারণ এই মত জাতীয়তাবিরোধী তথা ধর্মবিরোধী।

মার্কসবাদ তথা বামপন্থা জাতীয়তাবিরোধী হবার কারণ অতি বিচিত্র। এর কারণ মার্কসবাদের কেতাবে লেখা আছে দুনিয়ার যত সর্বহারা এক হও, কারণ শেকল ছাড়া তোমাদের কিছু হারাবার নেই। এ রকম গাঁজাখুরি বক্তব্য গত তিন শতাব্দীতে কেউ রেখেছে কি না সন্দেহ। এর কারণ পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কিন্তু দুনিয়ার সব মজদুরের পক্ষে জাতি, ভাষা, ধর্ম মায় চামড়ার রঙ পর্যন্ত ভুলে একজোট হওয়া যে কল্পনাবিলাস তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। এসব ভুলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ পরীক্ষালব্ধ ফল কি বলে, দিয়ে ব্যাপারটা দেখা যাক্। এসব তত্ত্ব মার্কসসাহেব ফেঁদেছিলেন প্রায় একশো পঞ্চাশ বছর আগে। তাহলে এতদিনে নিশ্চয়ই দুনিয়ার মজদুরের এক হয়ে যাওয়া উচিত ছিল ! কিন্তু কাজে দেখা গেল যে এই পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী সি পি আই (এম) চালিত সরকারের পুলিশ, মার্কসবাদী এস ইউ সি আই দলের মাধাই হালদার নামক জনৈক বিক্ষোভকারীকে গুলি করে খুন করল, সি পি আই (এম) এর ঘোড়সওয়ার বাহিনী দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর গ্রামে মার্কসবাদী আর এস পি-এর কর্মীদের কোতল করল। অর্থাৎ দুনিয়ার মজদুর এক হওয়া দূরস্থান, মার্কস সাহেবের দেড়শো বছর পরে এই পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদীরা পর্যন্ত এক হতে পারল না, একে অন্যের ওপর গুলি চালাল।

অতএব দুনিয়ার মজদুর কখনো এক হবে না। কিন্তু কেতাবে যে লেখা আছে, সেটা বামপন্থীরা ভোলে কি করে। অতএব মার্কসবাদীরা সিদ্ধান্ত করল, অন্য দেশের মজদুরকে লাল পতাকাতলে যদি টেনে আনতে

নাও পারি, নিজের দেশের বিরোধিতা তো করতে পারি! তাহলে কেতাবের কথা খানিকটা সপ্রমাণ হবে। এর এক গালভরা মার্কসবাদী নাম 'সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদ'। এই 'বাদ'-এর প্রতিপাদ্য হচ্ছে জাতীয় সীমারেখাগুলি কিছু নয়, শুধু শ্রমিক শ্রেণীকে ভুলিয়ে রাখার জন্যই এগুলি রাখা হয়েছে, পৃথিবীর যে প্রান্তে শ্রমিকের ওপর অত্যাচার হবে তার বিরুদ্ধেই অন্যপ্রান্তে প্রতিবাদ করতে হবে।

বাঙালি বামপন্থীরা এই আষাঢ়ে গল্প মার্কা-থিয়োরি ব্যবহার করেছে অত্যন্ত অদ্ভুত এবং সুচতুরভাবে, নিজের দেশের সমস্যার থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেবার জন্য। যখন এই পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্টের 'সুশাসনে' একের পর এক কারখানা ঝাঁপ বন্ধ করছে, যুবশক্তির সামনে মিছিলে শামিল হয়ে স্লোগান, চ্যাঁচানো ছাড়া কোনো ভবিষ্যৎ নেই, রাজ্যের পরিকাঠামো জরাজীর্ণ থেকে জরাজীর্ণতর হচ্ছে, কোনো বিনিয়োগকারী রাজ্যের পাঁচশো কিলোমিটারের মধ্যেও আসছে না, তখন রাজ্য সরকারের সামনে প্রথম চিন্তনীয় বিষয় কী ছিল? না, নেলসন ম্যাণ্ডেলার মুক্তি চাই। মুক্তি যখন হল এবং ম্যাণ্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী হলেন তখন প্রধান বিষয় কী হল? না নিপীড়িত কিউবার জনগণের পাশে দাঁড়াতে হবে। হাজারে হাজারে ছেলেমেয়ে, যাদের ক্ষীণতম ধারণা নেই যে কিউবা তাদের বাড়ি থেকে প্রায় কুড়ি হাজার কিলোমিটার দূরে, তারা মিছিল, পথসভা, চাঁদা তোলা ইত্যাদিতে লেগে গেল। কিউবার লোকজন এসব হৈ চৈ টেরও পেল না। কিউবা মিটবার পরে প্রধান বিষয় হল কী? না ইরাকে আক্রমণকারী মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো! আর এক নরপিশাচ সাদ্দাম হোসেন, যে নিজের ক্ষমতা নিষ্কন্টক করার জন্য নিজের হাতে নিজের জামাইকে খুন করেছে, নিজের দেশের কুর্দ উপজাতির মানুষদের বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে গণহত্যা করেছে এবং প্রতিবেশী কুয়েতের ওপর নির্লজ্জ অভিযান চালিয়েছে, সেই সাদ্দাম হোসেনের

সমর্থনে বামপন্থী পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল! এর মধ্যে অবশ্য আর একটু প্রচ্ছন্ন বজ্জাতি ছিল, সংখ্যালঘু মানসিকতায় সুড়সুড়ি দেওয়া। তারপর হঠাৎ দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী বেজায় ব্যস্ত ফারাক্কা বাঁধের জল বাংলাদেশকে দাতব্য করবার জন্যে! যাঁরা বাংলাদেশকে সামান্যমাত্রও জানেন তাঁরা এও জানেন যে বাংলাদেশে আর যাই হোক্, জলের অভাব নেই। ফারাক্কার জল বাংলাদেশে চলে গেলে যে কলকাতা বন্দর শুকিয়ে যাবে, কলকাতার পানীয় জলের লবণাক্ততা বাড়বে সে সম্বন্ধে সবাই নির্বাক্। আর পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীরা কেন? আমাদের সংবিধান অনুযায়ী পররাষ্ট্র তো কেন্দ্রীয় বিষয়! এরও কোনো জবাব নেই।

এই জ্যোতি বসুরা একসময় ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে এত ঝাঁপাঝাপি করেছেন যে বলা হত 'ভুলে গেছি বাপের নাম, জানি শুধু ভিয়েতনাম'। চিন যখন পণ্ডিত নেহেরুর তোষণকারী পররাষ্ট্র নীতির সুযোগ নিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করেছিল তখন এই জ্যোতি বসুই অম্লানবদনে বলেছিলেন হাজার হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়ের চূড়ায় কে কাকে আক্রমণ করেছে আমরা তার কী জানি। এবং, কে না জানে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যখন জাপানি সাহায্য নিয়ে, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে অসম সাহসিকতার সঙ্গে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন, তখন জ্যোতি বসু, মুজফফর আহমেদদের কাগজ 'জনযুদ্ধ'-ত কার্টুন ছাপা হয়েছিল, একটি কুকুর, তার মুখ নেতাজির, তার বকলস্ জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর হাতে ধরা। সেই বামপন্থীরা এখন তেইশে জানুয়ারি নির্লজ্জভাবে দন্তবিকাশ করে বলেন 'নেতাজি সম্বন্ধে আমরা ভুল করেছিলাম'! ভুল যদি করে থাকে তবে সেই ভুলের মাশুল দিতে কি বামপন্থীরা আজ প্রস্তুত? না শুধু 'সরি' বললেই পাপস্খালন হয়ে যাবে? বড় কমরেডরা কি নেতাজির মূর্তির পায়ে নাকে খরি দিতে তৈরি আছেন?

মোট কথা, জাতীয় স্বার্থের বিরোধিতা করা বামপন্থীদের মজ্জাগত। সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ ব্যাপারটা এখন ততটাই অলীক যতটা অলীক

জ্যোতি বসু প্রমুখ আজকালকার বামপন্থীদের সর্বহারা বলা। কিন্তু তবু বামপন্থীরা কখনো জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজে পিছপা হবেন না, কারণ এই ধরনের কাজই তাদের স্বাতন্ত্র্য এনে দেয়।

তথাকথিত বামপন্থী আন্তর্জাতিকতাবাদ নির্লজ্জ রাজনৈতিক ভণ্ডামিরও এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়েছিল তখন হিটলার ও স্তালিনের মধ্যে এক অনাক্রমণ চুক্তি চালু ছিল—তাই বামপন্থী ভাষায় যুদ্ধের নাম দেওয়া হয়েছিল 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'। আর যেই হিটলার স্তালিনকে আক্রমণ করল, এবং স্তালিন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ইংরেজদের দলে ভিড়ে গেল, অমনি সেই একই যুদ্ধের নাম হয়ে গেল—'জনযুদ্ধ', পিপ্‌ল্‌স ওয়ার! ১৯৫৬ সালে ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনী সুয়েজ যুদ্ধে মিশরের ওপর বোমাবর্ষণ করেছিল, এবং প্রায় একই সময় ক্রুশ্চেভের সভিয়েত ট্যাঙ্কবাহিনী হাঙ্গেরির স্বাধীনতাযুদ্ধকে চূর্ণ করতে চড়াও হয়েছিল। ভারতীয় কমিউনিস্টরা, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ও তার দোহার কৃষ্ণমেনন মিশর আক্রমণ নিয়ে গলা ফাটালেন, কিন্তু হাঙ্গেরির ব্যাপারে বোবা-কালা। আজকে এই ভারতের অন্যতম প্রতিবেশী দেশ বর্মা বা মায়ানমারে কতিপয় ক্ষমতালোভী সেনানায়ক গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে রেখেছে, নির্বাচিত নেত্রী আউঙ আন সু চি কে গত দশ বছর যাবৎ গৃহবন্দী করে রেখেছে। কোনো কমিউনিস্টের, কোন বামপন্থীর মুখ থেকে টুঁ শব্দটি শোনা যায়নি—অথচ এই সেনানায়করা কমিউনিস্টও নয়। আসল কারণ এই সেনানায়করা চিনের সমর্থনে টিকে আছে—কী করে ভারতীয় কমরেডরা তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারে?

বামপন্থীরা ধর্মবিরোধী একেবারে গোড়ার থেকে। ওদের গুরু মার্ক্সই বলেছেন 'ধর্ম মানুষের আফিমের মতো'। এই কথাটা কি সত্যি? যদি সত্য হত তা হলে এতদিনে আফিমের নেশা ছুটে যেত। মার্কস মারা

গেছেন আজ বহু বছর হল। এর মধ্যে নিশ্চয়ই হিন্দুত্ব, ইসলাম ইত্যাদি ধর্ম উবে যেত বা যাবার লক্ষণ দেখাত, মার্কসবাদ শক্তিশালী হত। কিন্তু কাজে কী দেখা যাচ্ছে? হিন্দুত্ব, ইসলাম আদি ধর্ম পূর্ণ মহিমায় বিরাজমান শুধু নয়, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে; আর লেনিনের পিতৃভূমি রাশিয়াতে লেনিনের নামাঙ্কিত শহর লেনিনগ্রাদের নাম বদলে আবার খ্রিস্টান সন্তের নামে সেন্ট পিটার্সবার্গ রাখা হয়েছে! অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিরিখেও, লেনিনবাদ হেরেছে, ধর্ম জিতেছে। এর মূল কারণ ধর্ম ছাড়া মানবজাতির এক পাও চলবে না, কিন্তু বামপন্থা বা লেনিনবাদ ছাড়া খুব ভালই চলবে।

পৃথিবীর পক্ষে যা শতকরা একশো ভাগ সত্যি ভারতের পক্ষে তা শতকরা হাজার ভাগ সত্যি। ধর্ম বাদ দিয়ে ভারতবাসীকে ভাবাই যায় না। স্বামী বিবেকোনন্দ বলেছিলেন "যদি ধর্ম পরিত্যাগ কর তবে তোমরা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ধর্মই আমাদের জাতির জীবন-স্বরূপ। ইহা দৃঢ় করিতে হইবে.... ইহাই আমাদের জাতীয় চেতনা, জাতির প্রাণপ্রবাহ। এই ভাব অনুসরণ কর, গৌরবান্বিত হইবে। এই ভাব পরিত্যাগ কর, তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়।" ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি, বিশ্ববরণ্যে দার্শনিক সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন লিখেছেন "যাই তোমার সমাজ সংস্কারের পরিকল্পনা হোক্, রাজনীতির বা অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের প্রচেষ্টাই তোমার হোক্, কোনো কিছুই কখনো সফল হবে না, যদি না তার পেছনে ধর্মের প্রেরণা থাকে।" বর্তমানে ভারতে যে দুর্নীতি সর্বব্যাপী তার অন্যতম কারণ ধর্মের থেকে সরে আসা। বামপন্থীরা মাঝে মাঝে জিগির তোলে ঃ 'ধর্মেব

* 'ভারতের ভবিষ্যৎ' ঃ স্বামী বিবেকানন্দ,প্রবন্ধ, 'জাগো যুবশক্তি'৩-য় সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯০।

** বিবেকানন্দ অ্যাণ্ড ইয়ং ইণ্ডিয়া ঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন, প্রবন্ধ, 'বিবেকানন্দ, দি গ্রেট স্পিরিচুয়াল টিচার—এ কমপাইলেশন'। অদ্বৈত আশ্রম, কলিকাতা, ১৯৯৫।

নামে রাজনীতি সবচেয়ে বড় দুর্নীতি'। এর উত্তরে বলা উচিত—ধর্মের নামে রাজনীতি, নয় নয় দুর্নীতি—বরঞ্চ বলা যেতে পারে অনেক বড় দুর্নীতি যে আজ জ্যোতি বসুর ছেলে কোটিপতি! অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবেই, যে ভারতবাসীকে ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত করার দায় বামপন্থীদের একার নয়—এতে অনেক বেশি মদত দিয়েছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, যাঁর মতামত খুবই বামপন্থা ঘেঁষা ছিল।

ভারতবাসীর এই যে ধার্মিকতা এর মূল কত গভীরে তা যে বামপন্থীরা বোঝে না তা নয়, কিন্তু বুঝে শুনে ভণ্ডামির আশ্রয় নেয়। এ সম্বন্ধে আলোচনা আগেই করা হয়েছে।

স্বামীজি বুক বাজিয়ে বলেছিলেন, ভারতকে কেউ ধর্ম শেখাতে পারবে না। এই ভারতে আদিকাল হতে বহু জ্ঞানী গুণী ধর্মবেত্তার জন্ম হয়েছে—তার মধ্যে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বাল্মীকি, বেদব্যাস থেকে আরম্ভ করে শঙ্কর, রামানুজ, বুদ্ধ চৈতন্য, মহাবীর, নানক, কবীর, গুরু গোবিন্দ পর্যন্ত অগণিত মানুষ আছেন। এই বাঙালির ঘরেই জন্মে চৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ, প্রভুপাদ প্রমুখ সারা পৃথিবীকে উজ্জীবিত করেছেন একটি মূলমন্ত্র নিয়ে, যার নাম ধর্ম। এমনকি হতে পারে যে এঁরা সব ভুল করেছেন, আর কমরেড লেনিন, যিনি আজ নিজের দেশেই অচ্ছুত, তিনিই ঠিক বলেছেন? অবশ্যই নয়! লেনিনই ভুল করেছেন, এবং সেই ভুলকে তার বাঙালি সমর্থকরা গলার জোরে তাপ্পি দিয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা করছে।

সাত ঃ বাম-বাংলার ফাঁকিবাজি

বামপন্থা ও বাঙালি-বামপন্থা পরিত্যাজ্য তার ষষ্ঠ কারণ ঃ এই বামপন্থা বাঙালিকে কর্মবিমুখ করেছে।

আজকে তাবৎ ভারতবাসীর কাছে বাঙালির এক অদ্ভুত পরিচয়, বাঙালিরা পশ্চিমবঙ্গে কাজে ফাঁকি দেয়, কিন্তু অন্য জায়গায় গেলে খুব ভালভাবে, সুষ্ঠুভাবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুম্বাইতে বাঙালি স্বর্ণকারদের খুব নাম, শিক্ষকতা, ফিল্ম, বিজ্ঞাপনের কাজ, কম্পিউটারের কাজ, ইত্যাদিতে বাঙালি যুবকরা শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বে নিজেদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, এবং রাখছেন। তা হলে সেই বাঙালিদেরই নিজের বলতে যে জমিটুকু আছে সেই পশ্চিমবঙ্গে এরকম বিশ্রী অবস্থা কেন? কেন বাঙালির ওয়ার্ক কালচারের এমন বদনাম? তার কারণ বামপন্থীরা গত পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙালিকে এই কুশিক্ষাই শিখিয়ে এসেছে যে কাজ করা বোকামি, কাজে ফাঁকি দেওয়াটাই চালাকের লক্ষণ, কাজ করলে মালিকের সুবিধা, ফাঁকি দিলে শ্রমিকের, কিছুতেই উৎপাদন বাড়ানো চলবে না, তার বদলে আরো বেশি করে লোক নিতে হবে, কিছুতেই কম্পিউটার ইত্যাদি প্রযুক্তি আনা চলবে না, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে কিছুতেই বেসরকারি করা চলবে না। কারণ সরকারি মালিকানায় চাকরির স্থায়িত্ব আছে, অর্থাৎ কাজে ফাঁকি দিলেও চাকরি যাবে না। এইসব বামপন্থী যুক্তি ও শিক্ষায় বাঙালি শ্রমিকের কতদূর উপকার হয়েছে তা আজ খতিয়ে দেখার সময় এসেছে।

সন্দেহ নেই, কাজে ফাঁকি দেওয়া, বা 'চাকরির স্থায়িত্ব' উপভোগ করা অতি উপাদেয়। আমার অফিস, ধরা যাক্ দশটা থেকে পাঁচটা। কিন্তু আমার যদি দশটার জায়গায় বেলা বারোটায় পৌঁছাবার অধিকার থাকে, পাঁচটার জায়গায় তিনটের সময় চলে আসার অধিকার থাকে, এবং

মাঝখানের সময়টাতে সারাদিনে একটা ফাইল এ টেবিল থেকে ও টেবিলে পাঠালেই কাজ চলে যায়-তবে রাষ্ট্রব্যবস্থা, যে সরকার, যে সংগঠন, যে মতাদর্শ, যে পার্টি এ ধরনের আচরণকে সমর্থন করে (মুখে না হলেও কাজে) আমরাই বা সেই মতাদর্শ, সরকার, সংগঠন বা পার্টি (অর্থাৎ বামপন্থীদের) সমর্থন করব না কেন? উপরন্তু এই অবাধ স্বাধীনতা সত্ত্বেও চাকরি যদি না যায়, এবং একমাত্র মূল্য যদি এই দিতে হয় যে মাঝে মাঝে মিছিলে যেতে হবে, ভোটের সময় পোলিং ডিউটিতে গিয়ে চরম অসাধুতা করতে হবে, যাতে করে এই সরকার কায়েম থাকে, এবং এই স্বেচ্ছাচারে যারা আমাদের আগলে রাখে সেই সংগঠনকে সমর্থন করতে হবে, তা হলে মিছিলে যাব, পোলিং ডিউটিতে অসাধুতা সমর্থন করব, ফাঁকি-সমর্থক, সংগঠনকে সমর্থন করব। তার কারণ, এর চেয়ে কাম্য অবস্থা আর কী হতে পারে?

একটু তলিয়ে ভাবলেই বোঝা যাবে যে এই অবস্থা আদৌ কাম্য নয়। প্রধানত দুটি কারনে।

প্রথমত আমি যদি ফাঁকি দিই তা হলে তো অন্যরাও ফাঁকি দেবে। এবং তাদের কাছে আমি যখন কাজের জন্য যাব তখন আমি 'পাবলিক', আর তাদের সংগঠন আছে, অতএব তখন তো আমাকে পুরো তাদের দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক আমি একজন সরকারি করনিক, আমি বারোটায় আসি, তিনটেয় যাই, আমরা কাছে কেউ কাজের জন্য এলে তার সঙ্গে কুকুরের মতো ব্যবহার করি। এখন একদিন আমার একমাত্র ছেলেটিকে সেই কুকুরে কামড়াল। চৌদ্দটা ইনজেকশন নিতে হবে, সরকারি হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম ওষুধ আছে তো সিরিঞ্জ নেই, সিরিঞ্জ আছে তো ডাক্তার নেই। আর চারপাশের অবস্থা এমন ক্লেদাক্ত যে সেখানে ইঞ্জেকশন নিলে জলাতঙ্ক ছাড়া অন্য কারণেই মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু কাউকে কিছু বলা চলবে না, কারন জি ডি এ

দের ইউনিয়ন অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু জি ডি এ মহাশয় কোথায় গিয়েছেন? গিয়েছেন পোস্ট অফিসে, কারণ তিনি সামান্য চাকরি করলেও, তাঁর ছেলেটিকে নিয়ে তাঁর অনেক আশাভরসা ছিল। কিন্তু ছেলের একটি ইন্টারভিউয়ের জন্য রেজিস্ট্রি চিঠি মুম্বাই থেকে একমাস আগে ছাড়া হয়েছিল, এখনো তাঁর কাছে পৌঁছায়নি, পোস্ট অফিসে পড়ে আছে কি না তার খোঁজ করতে গেছেন। গিয়ে দেখেন সাড়ে এগারোটা বাজে, কিন্তু ভারপ্রাপ্ত পোস্টম্যান আসেননি। আসার কথা দশটায়। আসবেন কি করে, কারণ তিনি থাকেন বহুদূরে, বাসে করে কাজে যাবেন বলে রওনা হয়েছিলেন, কিন্তু সরকারি বাস কিছুদূর এসেই বিকল হয়ে গেল, কারণ বাসের দেখভাল করবার দায়িত্ব যে কর্মীরা আছেন তাঁরা বাসটিকে ভাল করে না দেখেই ডিপো থেকে বার করে দিয়েছেন।

অর্থাৎ কী দেখছি? ফাঁকিবাজিতে ক্ষণস্থায়ী সুবিধা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলেরই অনেক বেশি কষ্ট পেতে হয়। এই ফাঁকিবাজিকে প্রশয় দেয় কে? দেয় প্রতি সংস্থার শ্রমিক ইউনিয়ন। তা হলে কি শ্রমিকদের ইউনিয়ন থাকবে না, শ্রমিকরা ম্যানেজমেন্টের পায়ে দলিত হতেই থাকবে? উত্তর, অবশ্যই নয়, ইউনিয়ন অবশ্যই থাকবে, কিন্তু সেই ইউনিয়ন থাকবে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্যই। কোনো রাজনৈতিক দলের কল্যাণের জন্য কখনোই নয়। এবং শ্রমিক ইউনিয়ন কখনোই ফাঁকিবাজিকে প্রশ্রয় দেবে না, কারণ (যেমন ওপরে দেখানো হয়েছে) ফাঁকিবাজিতে শেষ পর্যন্ত শ্রমিকেরই সমূহ ক্ষতি হয়।

ফাঁকিবাজির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বক্তব্য, ফাঁকিবাজির বদনাম একবার লেগে গেলে সে তল্লাটে আর বিনিয়োগ আসে না। পশ্চিমবঙ্গে যে মুখ্যমন্ত্রী আমলাদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ মোটেই আসছে না তার কারণ এই ফাঁকিবাজির বদনাম। এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস বলবার আছে। যে শ্রমিকরা শিল্পে কাজ পাবেন তাঁরা ফাঁকিবাজ হবেন এটাও

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগকারীদের মূল ভয় নয়। মূল ভয়, শিল্পে বিনিয়োগ করতে গেলে যে পরিকাঠামো দরকার সেই পরিকাঠামো সংক্রান্ত কর্মীদের ফাঁকিবাজি। এই পরিকাঠামো কর্মীরা প্রায় সবাই সরকারি। এঁরা রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণ করেন, সরকারি অনুদান ও অনুমোদনের ব্যবস্থা করেন, আইনশৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেন, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন, জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করেন। এঁদের কাজের মোটেই সুনাম নেই।

বিনিয়োগ না হলে কী হবে? নেহেরুর জমানায় বলা হত বিনিয়োগ তো করবে সরকার, কিন্তু সেদিন আর নেই। এখন বিনিয়োগ মানেই বেসরকারি। বেসরকারি বিনিয়োগ না হলে পদ সৃষ্টি হবে না, পদ সৃষ্টি না হলে চাকরি হবে না। বড় ছেলে বেকার , মেজ ছেলে হকার, ছোট ছেলে বোমা বানায়, মেয়ে মিছিলে যায়। (সাম্প্রতিক এক যাত্রার বিজ্ঞাপন থেকে উদ্ধৃত) এই অবস্থা কি কাম্য?

আট ঃ সর্বনাশের খতিয়ান

বামপন্থা অনুসরণ করার ফলে বাঙালির কী কী ক্ষতি হয়েছে? একবার উত্তর দিতে হলে কোথা থেকে আরম্ভ করা উচিত তা ঠিক করা কঠিন।

প্রথমত অর্থনৈতিকভাবে বাঙালি ডুবেছে। ডোবার প্রথম এবং প্রধান প্রকাশ সীমাহীন বেকারি। আজকের বাঙালি যুবকের সামনে টিউশনি এবং হকারি ছাড়া কোনো রাস্তাই খোলা নেই। আর কিছুদিন গেলে টিউশনিও জুটবে না, এবং হকারের মালও কেউ কিনবে না। এর অন্যান্য কারণ অবশ্যই আছে, কিন্তু শতকরা পঁচানব্বই ভাগ দায় বন্ধ্যা বাম রাজনীতি যাতে করে মানুষকে কাজ করতে বলার বদলে কাজে ফাঁকি দিতে শেখানো হয়েছে। জীবনে গতি আনার বদলে বন্‌ধ্ মিছিল রাস্তা রোকো করে গতি স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আজ কোনো শিল্পপতিকে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করতে বললে প্রথমেই বলেন "বুদ্ধদেবজির মতো এরকম অসাধারণ মুখ্যমন্ত্রী তো হয় না, তবে কি না বিনিয়োগ, হেঁ হেঁ একটু দেখতে হবে' অর্থাৎ মনে মনে ঃ "দাদা মাপ করুন—যে রাজ্য শ্রমদিবস নষ্টের রাজা, যেখানে সরকারি পার্টি পর্যন্ত বন্‌ধ্ ডেকে জনজীবন স্তব্ধ করে দেয়, সেখানে বিনিয়োগ আমার প্রতিযোগীরা করুক—আমি করব না।" নতুন বিনিয়োগ আসা দূরস্থান, বহুদিনের পুরনো হেড অফিসগুলি পর্যন্ত কলকাতা থেকে সরে যাচ্ছে। ইন্ডিয়ান অ্যালমুনিয়াম চলে গেছে, বিদেশি বিমানসংস্থা, যেমন ব্রিটিশ, এয়ার ফ্রান্স, কোয়ান্টাস ইত্যাদি চলে গেছে, অনেক দূতাবাস, যেমন ফরাসি, অস্ট্রেলিয়ান ইত্যাদি বন্ধ হয়ে গেছে। ফিলিপ্‌স্ ইণ্ডিয়া চলে গেছে, রেকিট বেনবিসার চলে গেছে, আই সি আই চলে গেছে।

দ্বিতীয়ত শিক্ষাগতভাবে বাঙালি ডুবেছে। যে রাজ্য স্বাধীনতার সময় দেশে সাক্ষরতার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ছিল (ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, অধুনা

কেরালার পরেই) সেই রাজ্য আজ সপ্তদশ স্থানে, যদিও সাক্ষরতা নিয়ে কিছুদিন ধরে বামপন্থীরা গলা ফাটালেন, "সাক্ষরতার ডাক দিয়েছে আয়রে তোরা ভাই" ইত্যাদি ন্যাকা ন্যাকা পঙক্তি ছাড়লেন। ক্যাডাররা দেওয়ালে লিখল, "চলো যাই, কিছু করে দেখাই" আর বুঝল "কিছু মেরে খাই", এবং তাই করল। প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি তুলে দিয়ে একপ্রস্থ সর্বনাশ করা হয়েছে, তাবৎ সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়েকে ইংলিশ মিডিয়াম পড়া (এই রাজ্য ও অন্য রাজ্যের) ছেলেমেয়েদের তুলনায় ল্যাংড়া করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্কুল কলেজ আজ আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, কিছু খুদে রাজনীতিবিদদের দলবাজির আখড়া। যেখানে স্বল্প খরচে সাধারণের ছেলেমেয়েরা ভালভাবে পড়াশুনা করতে পারত সেখানে, যেমন রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে, এইসব শিক্ষক নামধারী দলবাজরা অচলাবস্থা সৃষ্টি করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কারণ বামপন্থার মূলমন্ত্রই হল "আমি তো খারাপ কাজ করবই। তোমাকেও ভাল করতে দেব না।"

কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিককুল জানেন না যে এই রাজ্যে আজ শিক্ষায় শুধু বৈষম্যই নয়, কি পরিমাণে নিরক্ষরতার করাল গ্রাস এগিয়ে এসেছে। জুনিয়র হাই ও হাইস্কুলগুলি পার্টিবাজির আখড়া। পঞ্চায়েত ও পার্টি গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। এই অবস্থায় এগিয়ে চলেছে নিরক্ষরতার রথ। আজ থেকে তিন-চার দশক আগে গ্রামের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীগুলির মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার যে প্রবণতা শুরু হয়েছিল তাতে আজ শুধু ভাটার টান নয়, উল্টো গতি। কারণ সবাই বুঝে গেছে যে লেখাপড়া শিখে চাকরি পাওয়া যায় না। আর শুধু শেখার জন্য যে স্কুলে যাওয়া, সেটুকুও স্কুলে হয় না। তাই ছোটবেলা থেকেই দরিদ্র পরিবারের মা বাবারা তাদের সন্তানদের কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে। এই বামপন্থী রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বালক কিশোর শিশু সারাদিন এফ. এম. চ্যানেলের রেডিয়ো শুনছে আর জরির কাজ, বিড়ি বাঁধা, বাজি কারখানা, প্লাস্টিক কারখানা প্রভৃতি শিল্পে নিযুক্ত

হয়ে সামান্য রোজগারের বিনিময়ে সারাজীবনের নিরক্ষরতাকে বরণ করে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই হচ্ছে এ রাজ্যে সার্বজনীন শিক্ষার স্লোগানের ধাপ্পার পরিবর্তে বামপন্থী অবদান।

এরপর রাজ্যের চিকিৎসা ক্ষেত্রে। স্লোগানে সকলের জন্য স্বাস্থ্য। আর বাস্তবে, রাজ্যের জেলা ও মহকুমা হাসাপাতালগুলিতে কুকুর, বেড়াল ও শুয়ারের সুস্বাস্থ্যের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে কুকুর-বেড়ালও যায় না। মানুষের চিকিৎসা এ রাজ্যে কি হয় না? হয়, হয়! কলকাতার বি. এম বিড়লা, কোঠারি, রুবি, ডানকান, পিয়ারলেস, এ. এম. আর. আই., বেলভিউ, উড্‌সল্যাণ্ডস, আরও বেশ কিছুতে। তা সত্ত্বেও কোন্ দুর্মুখে বলে এরাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে না? তবে উপরোক্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে একবার নাম লেখালে ন্যূনতম বিল ওঠে ১৫ হাজার টাকা। আর গড়ে বিল ওঠে ৬০ হাজার টাকা, প্রায়শই লাখের অঙ্কে। এবং এ রাজ্যের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা এই বিল মেটাতে সক্ষম। তাই অনিল বিশ্বাস, সুভাষ চক্রবর্তী, জ্যোতি বসু প্রমুখ তাবড় বামপন্থীরা বেসরকারি হাসপাতালেই দেহ রেখেছেন, সরকারি হাসপাতালের ছায়া মাড়াননি। তাই এ রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার কোনো তীব্র সমালোচনা হয় না। কিন্তু দরিদ্র শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলির মেঝেতে পড়ে থাকা নিজের রুগিদেরকে রাত্রি জেগে পাহারা দিয়ে কুকুর-বেড়ালের হাত থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু বামপন্থী ট্রেড-ইউনিয়ন বলে বলীয়ান চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন না।

কিন্তু রাজ্যের চিকিৎসা ক্ষেত্রে দুর্দশা ও লজ্জার এখানেই শেষ নয়। এ রাজ্যে সর্বক্ষেত্রে এমনই বামপন্থী ওয়ার্ক কালচার গড়ে উঠেছে যে ধনী ও বুদ্ধিজীবীরাও টাকা খরচ করেও নামী দামি প্রাইভেট চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ভরসা রাখতে পারেন না। তাই ছোটেন তামিলনাড়ুর ভেলোরে, চেন্নাই-এর অ্যাপোলো বা শঙ্কর নেত্রালয়ে। সেখানে গেলে

অবাক হতে হয় এই দেখে যে সেখানে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি রুগি শুধু পশ্চিমবঙ্গের। শুধু বাঙালি রুগি ও তাদের সঙ্গীদের জন্য চেন্নাই শহরে চিপক স্টেডিয়ামের কাছে একটা পাড়ায় সমস্ত হোটেলের সাইনবোর্ড, মেনু বোর্ড বাংলায় লেখা। এগুলি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসা ক্ষেত্রে বামপন্থী সাফল্যের উজ্জ্বল নিদর্শন।

এরপর দেখা যাক রাজ্যের পরিবহণ ক্ষেত্র। বামপন্থী কমিউনিস্টদের ঘোষিত নীতি ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ও রাষ্ট্রের মালিকানা প্রবর্তন। এই নীতি অনুসারে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসেই বামফ্রন্ট সরকার কলিকাতা ট্রাম কোম্পানিকে জাতীয়করণ করল। সকলে ভাবল সরকার এই পথেই এগিয়ে রাজ্যের সম্পূর্ণ পরিবহণ ব্যবস্থাকে নিজের হাতে তুলে নেবে। আর আজকে অবস্থাটা কি? গোটা রাজ্যে পরিবহণ ব্যবস্থা আজ প্রাইভেট বাস মালিকদের উপর শতকরা ৯০ ভাগ নির্ভরশীল। অথচ বামপন্থী নয় এমন রাজ্যগুলিতে, যথা তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে পরিবহণ ব্যবস্থা অনেক বেশি পরিমাণে প্রত্যক্ষ সরকারি মালিকানায় ও পরিচালনায়। মুম্বাই, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি মহানগরীতে তো শুধু সরকারি বাসই চলে, প্রাইভেট বাস নেই। সেখানেও ন্যূনতম বাসভাড়া এক টাকা এবং তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারি পরিবহণ নিগমগুলি এত বাস চালিয়েও ভর্তুকি পশ্চিমবঙ্গের থেকে অনেক কম। অথচ এসব তথ্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছ থেকে সযত্নে আড়াল করে রাখছে আমাদের বাম মানসিকতাসম্পন্ন বাজারি সাংবাদিকরা। পরিবহণে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী অসাধুতা ও ভণ্ডামির চূড়ান্ত পরিচয় কলকাতায় সরকারি বাসের বহু প্রকারে। ধন্য সাম্যবাদ। ধন্য বাম রাজত্ব। আর ধন্য আমাদের বামপন্থী বাঙালির প্রতিবাদী কণ্ঠ।

আর মফস্বলে? জেলাগুলিতে? সেখানে সরকারি বাস চলে না। (উঃ বঙ্গে সামান্য কিছু চলে। কারণ কলকাতা থেকে দূর বলে সেখানে বাঙালির

বামপন্থাটাও একটু কম ঘন, তাই কিছু চলে।) প্রাইভেট বাসই সেখানে সাধারণ মানুষের একমাত্র উপায়। সেই বাসগুলিতে চেপে যাওয়ার সময় কোনো যাত্রী আর নিজেকে মানুষ বলে ভাবতে পারে না। এমনকি ছাগল ও ভেড়ার থেকে উন্নত কোনো পশুও নিজেকে ভাবা যায় না। তবু বামপন্থার কি অপূর্ব মোহ! কোনো প্রতিবাদ নেই। বাঙালি যে বামপন্থার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে! অল্প নেশা করলে মানুষ বা প্রাণী লাফ ঝাঁপ করে, হাত-পা ছোঁড়ে। কিন্তু নেশা বেশি হয়ে গেলে ঝিমিয়ে নেতিয়ে অচেতন হয়ে পড়ে। বামপন্থার নেশায় বাঙালির আজ সেই অবস্থা। বাঙালির এই নেশা ভাঙাতে হবে, তবেই বাঙালির পরিত্রাণ।

এরও পরে বাঙালি হিন্দুকে "নিজ বাসভূমে পরবাসী" করার সুচতুর ষড়যন্ত্র চলছে। মুসলমানের ভোটের জন্য বামপন্থীদের মুখ দিয়ে নাল পড়ে। কারণ কথিত আছে যে মুসলমানরা একা জোট হয়ে ভোট দেয়। এর নাম ভোট ব্যাংক রাজনীতি। এই রাজনীতি করতে গিয়ে হঠকারী বামপন্থীরা বাংলাদেশি মুসলমানের সঙ্গে ভারতীয় বাঙালি মুসলমানের পার্থক্য ইচ্ছে করে গুলিয়ে দিচ্ছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, যতদূর সম্ভব অনুপ্রবেশের মাধ্যমে বাংলাদেশি মুসলমানদের পশ্চিমবঙ্গে এনে বসত করানো, এবং নিজেদের ভোটব্যাংক মজবুত করা। এর ফলে দুই প্রজন্ম পরে যদি কোনো অঞ্চলে বাংলাদেশি মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হয়ে যায়, এবং হিন্দুদের খেদাতে আরম্ভ করে (যেমন খেদিয়ে ছিল বরিশাল থেকে শৈলেন দাশগুপ্ত, নোয়াখালি থেকে প্রশান্ত শূর, বিক্রমপুর থেকে জ্যোতি বসুকে) তাহলে তাই সই—এখনকার মতো তো ভোটব্যাংক ঠিক থাক। বামশাসিত ত্রিপুরায় আই. এস. আই. শিক্ষাপ্রাপ্ত উপজাতীয় জঙ্গিরা বাঙালিদের কচুকাটা করছে। সরকার নির্বিকার।

কলকাতা শহরের গুরুত্ব কমছে, কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব কমছে, পশ্চিমবঙ্গে পরিকল্পিত নগরায়ণ হচ্ছে না, দুর্গাপুর আসানসোল মরণদশায় ধুঁকছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে চোরাচালান হয়ে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে চাল,

ডাল, তেল, নুন, কয়লা, কেরোসিন, শাড়ি, লুঙ্গি, গবাদি পশু, বন্‌ধে হরতালে মিছিলে রোকোতে জনজীবন জর্জরিত। "আমাদের কোনো দোষ নেই, আমরা ধোয়া তুলসীপাতা—সব কেন্দ্রের দোষ, না হয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোষ—আমাদের কাজ লাগসই অজুহাত খাড়া করা, প্রচারে, মিছিলে পোস্টারে, ফেস্টুনে মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে রাখা"—শুধু এই মন্ত্র জপ করে এবং অভ্যাস করে বাঙালি বামপন্থীরা ক্ষমতা চেপে ধরে বসে আছে। রোম যখন পুড়ছিল তখন সম্রাট নিরো বেহালা বাজাচ্ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ যখন খাবি খাচ্ছে তখন এখানকার রাজাবাবু লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিচ্ছেন। বাঙালি বামপন্থার এই নিট ফল।

এই হচ্ছে মোটামুটি বামপন্থা, ওরফে মার্কসবাদ ওরফে কমিউনিজ্‌মের স্বরূপ। প্রশ্ন উঠতে পারে বামপন্থার কি সবই খারাপ, ভাল কি কিছুই নেই? অবিমিশ্র ভাল বা অবিমিশ্র খারাপ জিনিস এ জগতে অতি বিরল, অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের অপরাধীর মধ্যেও অনেক সময় একটি দুটি সুকুমার প্রবৃত্তি দেখা যায়, কিন্তু তাতে তার চরিত্রের গোটা' চেহারাটা বদলায় না। বামপন্থাও তাই। যে নামেই একে ডাকা হোক্, যে পার্টিই একে আশ্রয় দিক, মোটের ওপর এর চেহারাটা ন্যাক্কারজনক। আর বামপন্থা আশ্রয় করে যে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির সর্বনাশ হয়েছে সে কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না!

নয় ঃ মাওবাদ, মুসলিম তোষণ ও বামপন্থা

দশ ঃ এখন কর্তব্য—

যদি বর্তমান অবস্থা কাম্য না হয় তাহলে অবিলম্বে ফাঁকিবাজিকে বর্জন করতে হবে, ফাঁকিবাজি বদনাম ঘোচাতে হবে। এবং ফাঁকিবাজির প্রশ্রয়দাতা বামপন্থাকেও বর্জন করতে হবে। ইউনিয়ন অবশ্যই থাকবে, এবং শক্তিশালী হবে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হবে শুধু নিজের সভ্যদেরই কল্যাণ, সরকারি পার্টির ধামাধরা নয়, নেলসন ম্যাণ্ডেলা, কিউবা প্রভৃতি আবোলতাবোল ইস্যুও নয়, অকারণে বা অত্যন্ত স্বল্প কারণে, শুধু শ্রমিক তাতানোর জন্য বিক্ষোভ, ধর্মঘট, মিছিলও নয়।

আমাদের তিন-চার যুগের, অর্থাৎ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের ধ্যানধারণা পালটাতে হবে। বাকি পৃথিবীর কাছে বামপন্থার জায়গা বাজে কাগজের ঝুড়িতে, ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। সম্ভবত যাতে বাঙালি আমজনতা এই সত্য টের না পায় সেজন্যই বাঙালিকে ইংরাজি না শেখাবার জন্য এই আপ্রাণ চেষ্টা। কিন্তু বামপন্থী প্রচারমাধ্যমকে ছাপিয়ে গিয়ে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে বামপন্থা আধুনিক নয়, প্রাচীন। বামপন্থা বৈজ্ঞানিক নয়, অবৈজ্ঞানিক; বামপন্থা গণতান্ত্রিক নয়, স্বৈরতান্ত্রিক। বামপন্থা আজকের পৃথিবীতে ফ্যাশনেব্‌ল পর্যন্ত নয়। বামপন্থা মানুষে-মানুষে ভেদ করে না এটা ডাহা মিথ্যে কথা। তবে বামপন্থায় গরিবের পন্থা একথা সত্যি, কারণ গরিবকে গরিব করে রাখায় বামপন্থার কায়েমি স্বার্থ নিহিত। পৃথিবীর বিভিন্ন কোণ থেকে এখন বামপন্থীরা কলকাতায় এসে হতভম্ব হয়ে বলে, তাহলে পৃথিবীতে এমন কোণ এখনও আছে যেখানে বামপন্থা বেঁচে আছে! অনেকটা দুর্গম জঙ্গলে গিয়ে ডাইনোসর বেঁচে আছে দেখলে যে রকম অনুভূতি হয় সেই রকম। বামপন্থী রাজনীতি বাঙালিকে একটি

বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, জাতীয়তাবাদী শক্তি থেকে একদল নিষ্কর্মা, অজুহাতবাজ, দলবাজ, খেঁকুরে মিছিলকারীতে পরিণত করেছে। আবার আমাদের মানুষ হতে হলে বামপন্থাকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবেই।

শেষ প্রশ্ন তাহলে যা থাকছে তা হল, যদি বামপন্থা পরিত্যাজ্য হয় তা হলে কোন্ পন্থা বরণীয়? নিঃসন্দেহে ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। বহু দোষ সত্ত্বেও, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি এই ব্যাপারটা বুঝেছিলেন বলে সারা জীবন ধর্মাশ্রিত রাজনীতি করে গেছেন, প্রার্থনাসভা, রামধুন গান, অনশন ইত্যাদিকে পাথেয় করেছেন। এই গান্ধিই মুসলমানদের কাছে টানবার জন্য খিলাফত আন্দোলনের মতো পশ্চাদ্‌মুখী আন্দোলনের সঙ্গে শামিল হবার চেষ্টা করেছিলেন, যার ফল হয়েছিল ভয়াবহ, কিন্তু তাতে তাঁর ধর্মের ওপর নির্ভরশীলতাই প্রকাশ পায়। বর্তমানে সেটাকে 'সেকুলারবাদ' বলা হয়, যা রক্ষা করবার জন্য বুদ্ধদেব-সোনিয়া-মনমোহন প্রভৃতি আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছেন,তা আমাদের সংবিধানে সেভাবে ছিল না, ইন্দিরা গান্ধি নিজের রাজত্ব কায়েম করার জন্য জরুরি অবস্থার সময় বিয়াল্লিশতম সংশোধনের মাধ্যমে এনে ঢুকিয়েছিলেন। বর্তমানে ভারতে সেকুলারবাদ নামে যেটা চলে সেটা ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, ধর্মহীনতা, এবং তারই মোড়কে জাতপাতবাদী ও সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি। এই রাজনীতি কংগ্রেস, বামপন্থী, লালু, মুলায়েম সকলেরই বেজায় পছন্দ, কারণ ধর্ম আমাদের বারণ করে চুরি করতে, মিথ্যা কথা বলতে, ঘুষ খেতে—ধর্মহীন রাষ্ট্রে এসব নিয়ম মানার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

বামপন্থাকে বর্জন করার শেষ কারণ, বামপন্থা একটি বৃহৎ চালাকি, আমজনতাকে বোকা বানানোর চেষ্টা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না'। অ্যাব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, 'কিছু মানুষকে সর্বকালের জন্য বোকা বানানো যায়, সব মানুষকে কিছুকালের জন্য বোকা বানানো যায়, কিন্তু সব মানুষকে

সর্বকালের জন্য বোকা বানানো যায় না'। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন 'নাসাতো বিদ্যতে ভাবঃ, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' অর্থাৎ যা সৎ তা সবসময়েই আছে, যা অসৎ তা থেকেও নেই। বামপন্থা থেকেও নেই, কারণ বামপন্থা অসৎ।

আবার বলছি, বামপন্থার সম্বন্ধে বাঙালির মোহ এমন সুগভীর, 'সাম্যবাদ', 'মার্কসবাদ', 'কমিউনিজ্‌ম', 'বামপন্থা' প্রভৃতি শব্দগুলি গত ষাট-সত্তর বছরের অবিরাম প্রচারে বাঙালির মনে এমন সম্মানের জায়গা পেয়েছে যে কেউ যেন মনে না করে যে এই একটি পুস্তিকা পড়লেই বাঙালির মন থেকে এই ভূত ছেড়ে যাবে। প্রথম ধাক্কায় কখনোই এই ইমারত পড়বে না—অপর পক্ষে, শেষ ধাক্কায় পড়বেই। কারণ এই ইমারত অসাধুতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই গীতার ভাষায়, ইমারত 'থেকেও নেই'।

এই মোহের একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। এক ভদ্রলোক একদিন এই লেখককে বলেছিলেন 'আমি তো মনে করি স্বামী বিবেকানন্দের মতন এত বড় কমিউনিস্ট কখনো জন্মায়নি'। ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য খারাপ কিছু ছিল না, স্বামীজি যে মানুষ-মানুষে প্রভেদ না করে সব মানুষকে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করবার উপদেশ দিয়েছেন তাকেই এই ভদ্রলোক কমিনিস্টদের 'সব মানুষ সমান' এই ভণ্ড উক্তির সাথে একাসনে বসাচ্ছিলেন। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত কারণ 'কমিউনিস্ট শব্দটির সম্বন্ধে মোহ। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজির 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' কে কমিউনিস্ট সাম্যের সঙ্গে সমীকরণ করা অনেকটা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সীতারাম কেশরীর সমীকরণ করার মতো। দুজনেই কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, তাই বলে কি দজনে এক পদের লোক ? এই মোহ ভাঙাতে হলে মোহমুদ্গর প্রয়োজন। সেই মুদ্গরের বা মুগুরের নাম ধৈর্য। জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুত্বে দীক্ষিত বাঙালি, বামপন্থায় মোহগ্রস্ত বাঙালিকে অত্যন্ত ধৈর্য ধরে ভুল ভাঙাবেন। বামপন্থার ভণ্ডামি, বামপন্থার অমানবিকতা, বামপন্থার গণতন্ত্রবিরোধিতা, বামপন্থার ধর্মবিরোধিতা, ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী নেতাদের চালচলন থেকে দেখাতে হবে এদের

কথায় ও কাজে কত তফাত, এরা কত নীচু স্তরের কাজ অম্লানবদনে, শুধু দলের স্বার্থে করতে পারে। 'এরকম বামপন্থী' 'ওরকম বামপন্থী' ধরনের তফাত করার অর্থহীনতা বোঝাতে হবে। এটা বামপন্থীদের আরেকটা অদ্ভুত কায়দা, যখন দেখা যাচ্ছে কোথাও একটা কমিউনিজম্ ফেল মেরে গেল, তখন বলা 'আরে ধুর, এটা কি কমিউনিজম্, এটা কমিউনিজম্ই নয়, সত্যিকার কমিউনিজম্ কখনও ফেল মারে না।' এগুলো যে আবোল তাবোল প্রচার দিয়ে ব্যর্থতা ঢাকার প্রয়াস তা খুব ধৈর্য ধরে বোঝাতে হবে।

প্রায় চার প্রজন্ম ধরে বাঙালি যুবককে ভুল পথ দেখিয়েছে বাঙালি-বামপন্থা। ফলে বাঙালির ভণ্ড, ফাঁকিবাজ, ক্লিব বলে বদনাম রটেছে। অকালে মৃত্যু হয়েছে কত যুবকের—চারু মজুমদার প্রমুখের হঠকারী প্ররোচনায়! এইসব তাজা প্রাণগুলো বিফলেই গেছে, কারণ চারু মজুমদারের কথাই আজ কেউ মনে রাখেনি, তার অনুসারীদের কে মনে রাখবে? আজ উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে বামপন্থা নামক যে পদার্থটিকে বাঙালি এতকাল প্রগতিশীল, বিপ্লবী, নবযুগ আনার পথ বলে মনে করে এসেছে সেটা আসলে একটা বাসি মরা। এর সৎকার আশু প্রয়োজন। তারপর না হয় এটার একটা ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে রজনীগন্ধার মালা চড়িয়ে রাখা যাবে। আজ সারা পৃথিবীই এই পথে চলেছে, মার্কসবাবার কেতাব 'ডাস ক্যাপিটাল'-এর জায়গা আজ ডাস্টবিন। চিনে প্রধানমন্ত্রী ঝু রংজি হংকং-এর চিনভুক্তির পর কে বিশ্বব্যাংক-আই. এফ. এর সভায় বলেছেন কমিউনিজম্ সম্পূর্ণ ব্যর্থ, শিল্প ব্যবস্থার সব মালিকানা জাতীয় অর্থনীতির প্রাণচাঞ্চল্যই কেড়ে নেয়, গত প্রায় পয়ত্রিশ বছর যাবৎ বাজার অর্থনীতি অনুসরণ করে চিন দারিদ্র্য সীমার নিচে মানুষের সংখ্যা পঁচিশ কোটি থেকে পাঁচ কোটিতে নামিয়ে এনেছে। তাবৎ বিশ্বের ভুল ভেঙে গেছে, শুধু আমরা বাঙালিরা কি মারাত্মক নেশায় বুঁদ হয়ে শুঁড়িখানায় পড়ে আছি। এই নেশাগ্রস্ত বাঙালির নেশা ছোটাতে হবে। না হলে ডাইনোসরের মতোই বাঙালি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ও বি সি-দের সংরক্ষণ বাড়াবার ছল করে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সংবিধানবিরোধী। শুধু তাই নয়, এর ফলে হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের চাকরিপ্রার্থীদের দশ শতাংশকে অন্যায়ভাবে বঞ্চনা করা হল, যোগ্যতা থাকলেও তারা হিন্দু হবার অপরাধে চাকরি পাবে না। শুধু এই নয়, সিপিএম-এর পলিটব্যুরো সদস্যা বৃন্দা কারাত মসজিদের ইমামদের ভাতা বাড়াবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন।

ইদানীং বামপন্থীরা খুব উঁচু পর্দায় প্রচার কবছে বেসরকারীকরণ বা উদারীকবণ ও বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে। এই প্রচার ভুল তত্ত্ব এবং ভণ্ডামির সংমিশ্রণ। সরকারি কারখানা, সরকারি শিল্প যে কাজ করে না সে তো আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি! এই বামপন্থীর রাজ্য সরকারই স্টেট বাসের বেসরকারীকরণ করে দিয়েছে, কারণ বামপন্থী ইউনিয়নগুলি বাসকর্মীদের কাজে ফাঁকি দিতে শিখিয়েছে, ফলে স্টেট বাস চলে না। নেহরুকৃত সরকারি কারখানার নীতি থেকে সরে আসার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বেড়েছে এ কথা অনস্বীকার্য। সর্বোপরি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ফেল মেরে যাবার পরে, এবং চিন বহুজাতিক শিল্পকে আদর করে ডেকে আনার পরে বামপন্থীরা কি করে উদারীকরণের বিরুদ্ধে বলে জানি না। কিন্তু বলে—কারণ তারা বামপন্থী, তারা ভন্ড।

বিশ্বায়নের সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। আজ বিশ্বায়নের ফলে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তিবিদরা সারা পৃথিবী জুড়ে, বা ভারতে বসেই সারা পৃথিবীর কাজ করছেন। জাপান, জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ থেকে গাড়ি প্রস্তুতকারীরা ভারতে কারখানা করার ফলে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় যুবকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। ভারতের হাসপাতালে বিদেশ থেকে লোক চিকিৎসা করাতে আসছে, তাতেও প্রচুর কর্মসংস্থান হচ্ছে। কিন্তু তাতে কি? বামপন্থীদের প্রচার থামছে না, বলছে এইসব বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান লাভের টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে। তা তো যাবেই, তারা তো এখানে প্রেম বিতরণ করতে আসেনি,

ব্যাবসা করতে এসেছে—কিন্তু এই ব্যাবসার ফলে যে আমাদের যুবকরা কাজ পাচ্ছে, কাজ শিখছে সেটা তো আমাদের পরম প্রাপ্তি। এই প্রক্রিয়াতেই দেশ সমৃদ্ধ হয়, এই প্রক্রিয়াতেই যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপান, জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া আজ প্রথম বিশ্বে পৌঁছে গেছে বা কাছাকাছি। আর শুধু নিজের দেশের সরকারের হাতে শিল্প থাকলে অর্থনৈতিকভাবে বদ্ধ জলার অবস্থা হয়, যেমন হয়েছে আজকে দুর্ভিক্ষপীড়িত উত্তর কোরিয়ার বা মুদ্রাস্ফীতিপীড়িত কিউবায়।

বস্তুত বামপন্থীদের এর বিরুদ্ধে প্রচারের কারণ, সমৃদ্ধির আশঙ্কা। সাধারণ মানুষের সমৃদ্ধিকে বামপন্থীরা ভয়ানক ভয় করে, কারণ "লোকের পকেটে পয়সা হলে পার্টিকে আর পাত্তা দেবে না।"

সংযোজন —১

নকশালবাদ থেকে মাওবাদ ৪২ বছর (১৯৬৭-২০০৯) ধরেই সিপিএম ভারতের সংবিধান, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন ধ্বংসের চেষ্টা চালাচ্ছে। আলোচনা করেছেন।

দীপককুমার ঘোষ

নকশালবাড়ি এবং লালগড় দুটোই সিপিএমের পাপের ফল। অনিচ্ছাকৃত পাপ নয়। জেনে বুঝে করা পাপ। ১৯৬৭ সালে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নব নির্বাচিত সরকারকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য সিপিএমের ষড়যন্ত্রের ফল নকশালবাড়ি (১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৭০-৭৩)। সিপিএম তখন প্রধান বিরোধী দল, ক্ষমতার বাইরে থেকে সংবিধান ভাঙবার ষড়যন্ত্র করেছিল। ২০০১ সালের নির্বাচনের সময় সিপিএম প্রধান শাসকদল। তবু তাঁরা ষড়যন্ত্র করেছিল যাতে প্রধান বিরোধী দল বেশ কিছু বিধানসভা আসনে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করতে না পারে। তা নিশ্চিত করতে নির্বাচনের আগেই দলদাস পুলিশ এবং ভাড়াটে জনযোদ্ধা (পিপলস ওয়ার গ্রুপ বা পি.ডব্লিউ.জি) বন্দুকবাজদের সাহায্যে ৩টি জেলার হাজার হাজার গ্রাম থেকে লক্ষ লক্ষ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের গ্রামছাড়া করে দেওয়ার সিপিএমের ষড়যন্ত্রের ফল লালগড় (২০০০-০১ও ২০০৮-০৯)। শাসকদল হয়েও সিপিএম সংবিধান ভাঙবার ষড়যন্ত্র করেছিল।

পরাধীন ভারতে ১৯৪৬ সালের রাজ্য আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল অবিভক্ত সিপিআই। এই দলের মাত্র ৩ জন প্রার্থী জিতেছিলেন। জ্যোতি বসু জাঁদরেল কংগ্রেসপ্রার্থী হুমায়ুন কবীরকে হারিয়েছিলেন রেল কর্মচারীদের প্রক্সিভোট চুরি করে। বঙ্গবিভাগের ফলে পার্টির সদস্য একজন কমে গেল, দিনাজপুরের রূপনারায়ণ রায় পূর্ব পাকিস্তান আইনসভায় চলে

গেলেন। 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে স্লোগান দিয়েও জ্যোতি বসু কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার সদস্যপদ ছাড়লেন না। আইনসভার ভিতরে তিনি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, কারখানায়, অফিসে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় সিপিআইয়ের সশস্ত্র মিটিং, মিছিলের সন্ত্রাসের সমর্থনে গলা ফাটাতেন। প্রধানমন্ত্রী 'Premier' ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের আনা নিরাপত্তা বিলের বিরুদ্ধে তিনি স্মরণীয় বক্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২৫ মার্চ সংশোধিত ফৌজদারি আইনে সিপিআইকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে জ্যোতি বসুকেও গ্রেপ্তারের আদেশ দেন স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী কিরণশংকর রায়। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান লাগু হলে সংবিধানের ১৯(সি) ধারা অনুযায়ী ইচ্ছেমতো সংগঠন গড়বার নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হতেই হাইকোর্টের আদেশে পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। যে সংবিধানের বলে পার্টি নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। যে সংবিধানের বলে পার্টি নিষেধাজ্ঞা মুক্ত হল, জ্যোতি বসুরা জেল থেকে মুক্ত হলেন, সেই সংবিধানকে ধ্বংস করবার জন্যই সিপিআই আবার ষড়যন্ত্র শুরু করল। ১৯৫৩ সালে সহিংস ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে সহিংস শিক্ষক আন্দোলন এবং তারপর থেকে লুম্পেনদের সাহায্যে বাৎসরিক খাদ্য আন্দোলন করে সিপিআই সবসময়ই জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে বিব্রত রেখেছে। সংবিধান অধিকার দিয়েছে, তাই পার্টি গড়ব। পাটি গড়ে সর্বত্র তাণ্ডব করে আইনশৃঙ্খলা ভাঙব। সরকারের ঘুম কেড়ে নেব। দেশ গঠনের কাজে সবসময়ই বাধা দেব। সংবিধান অধিকার দিয়েছে, তাই নির্বাচনে লড়ে বিধানসভায় ঢুকে সেখানেও তাণ্ডব করব, জুতো ছুড়ব, কাঠের টুকরো ছুড়ব, শাসকদলের মহিলা সদস্যের চেয়ারে লালকালি ঢেলে রেখে তাঁকে বিব্রত করব। জনগণের রায়ে নির্বাচিত সরকারকে রাজ্যপাট থেকে টেনে নামাবার জন্য শাসকদলের নেতামন্ত্রীদের নামে মিথ্যা কুৎসা করব। গোপন সেল গড়ে তুলে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হব। আবার নির্বাচনে জাল, জুয়াচুরি, রিগিং করে ক্ষমতায় এসে বিরোধীদলের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেব, নির্বাচনের আগে বিরোধী

দলের সমর্থকদের পুলিশ ও ক্যাডার দিয়ে মেরে গ্রামছাড়া করে দিয়ে একচেটিয়া ভোট করব। এই দ্বিমুখী নীতি ও কর্মসূচিই সবসময় পালন করে চলেছে। সিপিআই ও পরবর্তীকালে সিপিএম। সংবিধানকে ব্যবহার করেই ক্ষমতায় আসব, তারপর ভিতর থেকে সংবিধানকে ধ্বংস করব—এটাই কমিউনিস্টদের একমাত্র লক্ষ্য।

১৯৫২ সালে দেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করবার জন্য ২টি ফ্রন্ট হয়েছিল। প্রথমটিতে ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক, শরৎচন্দ্র বসুর সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি, বলশেভিক পার্টি, আই. এন. এ এবং সিপিআই, এর নাম ছিল ইউনাইটেড সোস্যালিস্ট অর্গানাইজেশন কমিউনিস্ট অ্যালায়েন্স। দ্বিতীয়টিতে ছিল রুইকর বা সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক সোস্যালিস্ট পার্টি, আরসিপিআই (সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর গোষ্ঠী) এবং আর এস পি। নির্বাচনে প্রথম ফ্রন্টের মোট আসন হল ৪১— সিপিআই ২৮, ফ. ব. ১২ ও আর. এস. পি ১। অন্য জোটের মধ্যে রুইকর বা সুভাষবাদী ফ. ব. মাত্র ১টি আসন জিতেছিল, তাও সম্ভব হয়েছিল সিপিআই আসানসোলে প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল বলে। ওই নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতার হিন্দুস্থান পার্কের বাসিন্দা জ্যোতি বসু উত্তর ২৪ পরগনার বরানগর কেন্দ্রে উদ্বাস্তু ও পাটকল শ্রমিকদের প্রচুর ভুঁয়ো ও ছাপ্পা ভোটে জিতেছিলেন। সেবার তিনি বিরোধী দলের নেতা বলে অধ্যক্ষের রুলিং আদায় করে নিয়েছিলেন। বিধানসভায় সত্যমিথ্যা জড়িয়ে অনেক গরম গরম বক্তৃতা করে ও তাঁর বাবা নিশিকান্ত বসুর রক্ষাকর্তা মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের নামে অযথা গালাগালি করে আমজনতার কাছে কমিউনিস্ট পার্টির মুখোশ হয়ে উঠলেন।

১৯৫৭ সালের নির্বাচনে বিরোধী ২ ফ্রন্টের প্রথমটি ছিল ইউনাইটেড লেফট ইলেকশন কমিটি —যার শরিক ছিল সিপিআই, আরএসপি, এসইউসি, বলশেভিক পার্টি, পিএসপি, ফ.ব মার্কসবাদী ফ.ব., ডেমোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ড ও রিপাবলিকান পার্টি এবং কিছু নির্দল নেতা। দ্বিতীয়টি ছিল ইউনাইটেড

ডেমোক্র্যাটিক পিপলস ফ্রন্ট- যার মধ্যে ছিল আর.সি.পি.আই (সৌমেন ঠাকুর গোষ্ঠী), জনসংঘ, হিন্দু মহাসভা ও কিছু নির্দলীয় নেতা। নিজেদের ৪৬ এবং সমর্থিত ৫ নির্দলকে নিয়ে সিপিআইয়ের প্রাপ্ত আসন হয়েছিল ৫১ এবং ফ্রন্টের মোট আসন ছিল ৮৫। অন্য ফ্রন্ট পেয়েছিল মাত্র ২টি আসন। এবার জ্যোতি বসু বিরোধী নেতার সরকারি স্বীকৃতি পেলেন।

১৯৬২ সালের নির্বাচনে সিপিআই বিকল্প সরকার গঠনের ডাক দিয়ে ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্ট গড়ে তুলেছিল এবং ফ্রন্টের ৭৭ আসনের মধ্যে একাই ৪৯ আসন পেয়েছিল। অন্যান্য বিরোধীরা পেয়েছিল ১৫টি আসন। ১৯৬৩ সালে সিপিআই কার্যত ভাগ হয়ে গেলে মূল পার্টিতে রয়ে গেলেন মাত্র ১২ জন বিধায়ক। বাকিদের মধ্যে সিদ্ধার্থ রায়, বিজয়কুমার ব্যানার্জি সহ ১০ জন এক 'স্বতন্ত্র ব্লক' গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৬৪ সালে সিপিএম আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হলেও জ্যোতি বসু আর বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি ফিরে পাননি।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনের আগে সিপিএমের অভ্যন্তরে উগ্রবামপন্থীদের ঠান্ডা রাখতে গিয়ে কিছু দুর্গম গ্রামাঞ্চলে ও শিল্পাঞ্চলে গোপন সেল তৈরি করে নির্বাচন শেষ হতে না হতেই এসব সেল থেকে সশস্ত্র হাঙ্গামা শুরু করে নবনির্বাচিত কংগ্রেস সরকারকে প্রচণ্ড চাপে ফেলে পদত্যাগে বাধ্য করিয়ে বা কেন্দ্রকে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে বাধ্য করে রাজ্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করবার যে ভয়ানক ষড়যন্ত্র সিপিএম করেছিল, তারই ফলে নকশালবাড়ির আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সব খবরই পেয়েছিল এবং জেলায় জেলায় এসপিদের সর্তক করে দিয়েছিল। দার্জিলিং জেলার এসপি-র কতর্ব্যে ইচ্ছাকৃত গাফিলতিতেই নকশালবাড়িতে রক্তপাত এড়ানো যায়নি।

'কিছুদিন ধরেই সময় সময় পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম)-এর ভবিষ্যৎ নীতি সম্বন্ধে আমি আপনাদের অবহিত করে যাচ্ছি। জানা গিয়েছে যে এই

পার্টি সংগঠন মজবুত করে তোলা ছাড়াও নতুন সরকারকে উৎখাতের (overthrow) লক্ষ্যে সংগ্রামী (militant) আন্দোলন শুরু করবার জন্য গ্রামীণ এলাকায় ও শিল্পাঞ্চলে ছোট ছোট গুপ্তচক্র (cell) গড়ে তুলবার জন্য আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে কাজে লাগাতে চায়। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ পার্টির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রামী বিক্ষোভ শুরু করতে পার্টি ক্যাডারদের উদ্বুদ্ধ করবার জন্য বক্তব্য রেখে চলেছেন।

'কিছুদিন যাবৎ এও শোনা যাচ্ছে যে, পার্টি ক্যাডারদের মধ্যে উগ্রপন্থী ও দুঃসাহসিক ঝুঁকিশীল (extremist adventurist) একটি গোষ্ঠী সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না এবং মনে করে যে, নির্বাচনী প্রচারে শক্তি ব্যয় করা সময়ের অপচয়। এই গোষ্ঠীর মতে, ভারতবর্ষের অবস্থা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে অনুকূল। অতি সম্প্রতি আমরা কিছু প্রচারপত্র পেয়েছি, যাতে জনগণকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করবার জন্য প্ররোচনা এবং রেললাইন ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালাবার জন্য বিস্ফোরক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।...'

জরুরি এবং অত্যন্ত গোপনীয় ৪৩৭৬ (১৬) নম্বরের এই নাতিদীর্ঘ চিঠিটি রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান বিষ্ণু বাগচী ১৯৬৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ নির্বাচনের দুই সপ্তাহ আগেই সব জেলার এসপি-দের কাছে লিখেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা দপ্তরে তখন ডিজি, এডিজি এমনকী আই জি- দেরও ছড়াছড়ি ছিল না। রাজ্যপুলিশ তখন মাথাভারি ছিল না। একজন আইজি ও ৭/৮ জন ডিআইজি ছিলেন। গোয়েন্দা দপ্তরের বড়কর্তাও ছিলেন একজন ডিআইজি। গোয়েন্দা দপ্তরকে পার্টির ভিতরের গোপন খবর জানাতেন পার্টিরই কিছু সদস্য। তারাই পার্টির গোপন চিঠি, দলিল, পুস্তিকা গোয়েন্দা দপ্তরকে দিতেন। তাদের দেওয়া খবরের ভিত্তিতেই গোয়েন্দা প্রধান জেনে যান যে, সিপিএমের হিসাব ছিল, ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে যে সাধারণ

নির্বাচন হবে; তাতে কংগ্রেসের আসনসংখ্যা কমবে। সদ্য গঠিত বাংলা কংগ্রেস কিছু আসনে কংগ্রেসকে হারাবে। তবে কংগ্রেসই নতুন সরকার গঠন করবে। এই সরকার গুছিয়ে বসবার আগেই রাজ্যের অনেক অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যাতে কংগ্রেস সরকার না চালাতে পারে। হয় কংগ্রেস সরকার পদত্যাগ করবে, নয়তো কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করবে। বাংলা কংগ্রেস সৃষ্টিতে প্রেরণা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। তিনি ও প্রফুল্লচন্দ্র সেন, পরস্পরকে ঘোর অপছন্দ করতেন। জ্যোতি বসু, ভূপেশ গুপ্ত প্রমুখ বিলেতি বন্ধুরা ইন্দিরা গান্ধির প্রফুল্ল সেন বিদ্বেষের কথা জানতেন। তাছাড়া দলের চিনপ্রেমী উগ্রপন্থী নেতাদেরও ঠান্ডা রাখবার দরকার ছিল।

এই চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে গোয়েন্দা প্রধান লিখেছিলেন : 'আপনি অত্যন্ত সর্তক থাকবেন। নাশকতামূলক কাজ বা সংগ্রামী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতির খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সর্তকতামূলক ব্যবস্থাদি নেবেন। সবকিছু আমাকে জানিয়ে রাখবেন। এই উগ্রপন্থী গোষ্ঠী আসন্ন ঘটনাবলির মোকাবিলায় প্রস্তুতির জন্য আমাদের কতটা সময় দেবে, আমি জানি না। তবে এটা খুবই সম্ভব যে, সাধারণ নির্বাচনের পর রাজ্যে এবং কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠন এবং সেই সরকার ঘটনাবলির উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার আগে সাময়িক রাজনৈতিক শূন্যতার পূর্ণ সুযোগ পার্টি গ্রহণ করবে। আমরা জানি যে, সাধারণ নির্বাচনের সময় আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য আপনার লোকবল ও সরঞ্জামসমূহ খুবই বিস্তৃত হয়ে আছে (strained) এবং এখনি নাশকতা বিরোধী (anit-sabotage) কাজের জন্য আলাদা করে লোক আপনি দিতে পারবেন না। কাজেই, রেলওয়ের মুখ্য নিরাপত্তা আধিকারিকের সঙ্গে পরামর্শ করে রেললাইনে নাশকতা আটকানোর জন্য রেল সুরক্ষা বল (RPF) ও গ্রাম প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলিকে (Village Resistance Groups) কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করুন। উত্তরবঙ্গে রেললাইনে নাশকতার সম্ভাবনা খুব বেশি। নির্বাচন

শেষ হয়ে যাওয়া মাত্রই আপনি সিপিআই(এম) ও এ জাতীয় অন্যান্য সংগঠনের আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবার মতো অবস্থা তৈরি করবার বিষয়ে নজর দিয়ে আপনার লোকবল নতুনভাবে নিয়োজিত করবেন।'

এই চিঠিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে দার্জিলিং জেলার এসপি যদি সময়মতো প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতেন, তবে রাজ্য রাজনীতির ইতিহাসে (১৯৬৭-৬৮) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নকশাল উপদ্রব হয়তো শুরুই হত না। 'প্রায় তিনমাস পার হয়ে গিয়েছিল, সে সময় যদি পুলিশ একটি ঘটনারও তদন্ত করত কিংবা পুলিশের অস্তিত্বের প্রমাণ দিত তাহলে পুলিশকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সাহস আন্দোলনকারীরা অর্জন করতে পারত না এবং সম্ভবত গুলিবর্ষণের প্রয়োজন হত না।' ২৪ মে সকালে নিরস্ত্র পুলিশদের লক্ষ করে তির ছুড়ে মেরেছিল নকশালবাড়ীরা এবং পরদিন পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছিল। এই দুটি ঘটনা সম্বন্ধেই তাঁর বই 'নকশালবাড়ি থেকে আরবান গেরিলা'-তে এই মন্তব্য করেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত (পৃ. ১৭)।

ঠিক যেমন, গত বছরের (২০০৮) ৫ নভেম্বর লালগড়ের ছোটপেলিয়া গ্রামের আদিবাসী পাড়ায় ঢুকে গভীর রাতে নিদ্রামগ্ন সাঁওতাল রমণীদের উপর নিদারুণ পুলিশি অত্যাচারের পর পশ্চিম মেদিনীপুরের এসপি যদি আদিবাসীদের দাবি মতো ক্ষমা চেয়ে নিতেন তবে হয়তো যৌথবাহিনীকে ল্যাজেগোবরে করে দেওয়ার মতো মাওবাদী উপদ্রব সেখানে ছড়িয়ে পড়ত না। লালগড় নিয়ে কেউ বই লিখলে, তাঁকে লিখতেই হবে যে, ছোটপেলিয়া গ্রামে পুলিশি অত্যাচারের পর পুলিশ ক্ষমা চেয়ে নিলে পুলিশি সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটিও তৈরি হত না, এই কমিটির ফাঁকফোকর দিয়ে মাওবাদী কার্যকলাপও শুরু হত না। শুধু রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তরই নয়, শুধু জেলার গোয়েন্দা বিভাগের অনেক গোপন রিপোর্টও নয়, নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ি থানায় দায়ের করা ৪০টির বেশি অভিযোগও ২ মাসেরও বেশি সময় চেপে

রাখতে গিয়েই জেলার এসপি নকশালবাড়ি সৃষ্টিতে পরোক্ষ মদত দিয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরেই যদি উপদ্রবকারীদের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হত, যদি সে আমলের অস্ত্র তির-ধনুক, টাঙি, বল্লম ইত্যাদি আটক করা হত, তবে হয়তো নকশাল উপদ্রব শুরুই হত না। কোনওমতে শুরু হলেও, কিছুতেই এত ছড়িয়ে পড়ত না। সেকালে জনমত কিন্তু প্রবলভাবেই ধান লুট বা জমি দখলের মতো অপরাধের বিরুদ্ধে ছিল। সেদিনও একটির পর একটি শুধু গোয়েন্দা রিপোর্টই নয়, সেকালের সব সংবাদপত্রেই দিনের পর দিন এই জনমত স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছিল।

৪২ বছরের ব্যবধান নকশালবাড়ি ও লালগড়ের মধ্যে। কিন্তু কী অদ্ভুত মিল যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে। তখনও নকশালবাড়িতে একপক্ষে ছিল সিপিএম ও পুলিশ, অন্যপক্ষে ছিল জনসাধারণ। আজও ঠিক তাই। একপক্ষে সিপিএম ও পুলিশ, অন্যপক্ষে জনসাধারণ। সেদিনও সিপিএমের অপকর্ম ঢাকতে উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তা ব্যস্ত ছিলেন, ফলে নিরীহ পুলিশের ও মানুষের প্রাণ গিয়েছিল। আজও লালগড়ে সিপিএমের অপকর্ম ঢেকে নেতাদের বাঁচাতে পুলিশের বড় কর্তারা ব্যস্ত। তাই প্রাণ যাচ্ছে নিরীহ পুলিশ ও সাধারণ মানুষের।

তখন নকশালদের হাতে আধুনিক কেন, সাধারণ আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল না, তাই হতাহতের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত। আজ মাওবাদীদের হাতে রয়েছে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, তাই হতাহতের সংখ্যাও অনেক বেশি। ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়িতে জনমত ছিল সিপিএমের প্রয়োজনে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে, আজ লালগড়ে জনমত সিপিএমেরই প্রয়োজন পুলিশের অতি সক্রিয়তার বিরুদ্ধে।

।। ২ ।।

সেদিনের নকশালবাড়ি এবং আজকের লালগড় দুটোই সিপিএম পার্টির ইচ্ছাকৃত পাপের ফল। সেদিন ছিল একদিকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ ও অন্যদিকে নির্বাচনের ফলে গঠিত কংগ্রেসের সম্ভাব্য নতুন সরকারকে উৎখাত করবার লক্ষ্যে সংগ্রামী আন্দোলন করে আইনশৃঙ্খলা

বিপর্যস্ত করবার গোপন ষড়যন্ত্র। সেদিন ছিল পার্টির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যা সামাল দিতে গিয়ে পার্টি নকশালবাড়ির দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনে (১৯৬৯-১৯৭১) লুম্পেন খুনিদের সাগ্রহে কাছে টেনে নিয়েছিল। সেই শুরু। আজ লালগড় হচ্ছে পার্টির সার্বিক লুম্পেনাইজেশন যাকে হার্মাদিকরণ বলা যায় এবং আগাপাছতলা ধারাবাহিক দুর্নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল।

লালগড়ের জোনাল সম্পাদক অনুজ পান্ডের, পার্টি যাকে মাসে দেড়হাজার টাকা ওয়েজ দেয়, ধরমপুরের দোতলা মর্মর প্রাসাদ সবাই টিভিতে দেখেছেন। জেলা সম্পাদক দীপক সরকারের নিজ নামে এ বছরই মেদিনীপুর শহরে ১ কোটি ২২ লক্ষ সাদা টাকায় মাত্র ১৫ কাঠা জমি কিনবার, যাতে আরও অন্তত ২ কোটি কালো টাকা হাতবদল হয়েছে—খবরটা হয়তো অনেকে জানেন না। আজ কংগ্রেস বা বিজেপির তুলনায় সিপিএমের স্থাবর সম্পত্তির দাম অনেক বেশি। সর্বহারার পার্টির মাছগুলি আজ আর কোনও শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাচ্ছে না।

সিপিএমের মতে পার্টির জন্ম হয়েছিল ১৯২০ সালে তাসখন্দে, প্রতিবছর এই দিনেই পার্টির জন্মদিন পালন করে সিপিএম। কিন্তু সিপিআইয়ের মতে পার্টি জন্মেছিল কানপুর সম্মেলনে আরও পাঁচ বছর পর ১৯২৫ সালে। ১৯২০- তেই হোক, বা ১৯২৫ এই হোক, জন্মলগ্ন থেকেই পার্টিতে চলছে তীব্র ব্যক্তিসংঘর্ষও গোষ্ঠীবিরোধ। তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের আড়ালে সবসময়ই চলে আসছে পার্টির আসল ক্ষমতা অর্থাৎ তহবিল দখলের লড়াই।

স্বাধীনতার আগে পার্টি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের আগ্রহ ছিল সীমিত। পত্রপত্রিকায় খবরও খুব বেরোত না। নেতারা যা লিখে গেছেন, তা সবই নিজের বা নিজের গোষ্ঠীর কোলে ঝোল টেনে। এসব লেখা থেকে সত্য উদ্ধার করা খুবই কঠিন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশিকে কোণঠাসা করবার জন্য বিটি রণদিভে কথায় ও শরীরী ভাষায়

শালীনতা-শোভনতার সব সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। সাধারণ সম্পাদক হয়ে অবশ্য অচিরেই নিজে নিরাপদ দূরত্বে থেকে অন্যদের জেলের ভিতরেই গোলমাল পাকাতে বলে তাঁদের নিপীড়নের মুখে ঠেলে দিয়ে, ২ বছর পরে তাদের আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন।

১৯৫০ সালের ১ জুন যোশির মতোই রণদিভেকেও পদচ্যুত হতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পার্টি তাকে বহিষ্কার করেছিল। রাজেশ্বর রাও ও বাসবপুন্নাইয়ার যে অন্ধ্র দলিল নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরো গ্রহণ করেছিল, তাতে বলা হয়েছিল চিন ও ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের অনুকরণে 'পার্টির নেতৃত্বে মুক্তি ফৌজ ও মুক্তঅঞ্চল সৃষ্টি করে গ্রাম থেকে শহরে অভিযান চালিয়ে সমগ্র দেশকে মুক্ত করতে হবে। চিনের পথ মানে প্রথমে শিল্পাঞ্চলের গুরুত্ব থাকবে না। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের মধ্য দিয়েই শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব পরিস্ফুট হবে।' এটাই তো মাও-সে-তুংয়ের চিন্তাধারা। মাওবাদ বলে কিছু হয় না, বলছে সিপিএম। মাওপথ বলেও কি কিছু হয় না ?

কেন্দ্রীয় পার্টিতে যেমন, রাজ্য পার্টিতেও তেমন সব সময়ই চলে আসছে তীব্র ব্যক্তিসংঘর্ষ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। বেঙ্গল লবি, কেরল লবি, অন্ধ্র লাইন, বম্বে লাইন। আবার এসব লবি বা লাইনের মধ্যে ও সবসময়েই রয়েছে আরও ছোট ছোট গোষ্ঠী। মধ্য ও নিম্নমেধার সব নেতারা কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না। আর এদের সবার উপরে সবসময়েই রয়েছে বিদেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির তাত্ত্বিক ভেদাভেদের প্রভাব। বি-স্ট্যালিনিকরণ শুরু সংশোধনবাদী। নিউটনের গতিতত্ত্বের দ্বিতীয় আইন অনুসারে চিনা নেতারা তখন হয়ে গিয়েছিলেন অতি বামপন্থী হঠকারী। এখন মাওবাদীরা সিপিএমকে অভিভাবকও বলে। কালক্রমে চিনা নেতারাও ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন মাওপন্থী, লিউ শাও চি পন্থী, লিনপিয়াওপন্থী ইত্যাদি ভাগে। সাধারণ মানুষের মাথায় তত্ত্বের এসব কচকচানি ঢুকবে না জেনেও সব দলের ওঁর দলের দেশি কমিউনিস্টরাও দল ভাগ করে নেতা সাজতেন। আজও সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।

১৯৬২ সালে চিনের ভারত আক্রমণের সময় অবিভক্ত পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সব খবরই কেন্দ্রীয় স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ পেয়ে যেতেন পার্টিরই কিছু নেতার কাছে। চিনপন্থী নেতাদের জেলে পাঠিয়ে পার্টিযন্ত্রের দখল নেওয়াই ছিল এইসব নেতাদের উদ্দেশ্যে। পার্টিযন্ত্র হাতে থাকলেই পার্টির তহবিলও হাতে থাকে। জেল থেকে বেরিয়েই ক্রুদ্ধ চিনপন্থী নেতারা পার্টিভাগের উদ্যোগ নিলেন। মাদুরাই অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারেই পার্টি ভাগ হল। কিন্তু সিপিএমের ভিতরেই রয়ে গেলেন পরবর্তীকালের নশালপন্থী সব নেতা। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে এই উগ্রবামপন্থী নেতাদেরই কিছুটা কনসেশন (concession) দেওয়ার জন্যই সিপিএম নির্বাচনের পরেই গোপন সব সেলের মাধ্যমে সংগ্রামী আন্দোলন করে নবনির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করবার পরিকল্পনা করেছিল। সিপিএমের যে বাবুশ্রেণির নেতারা জ্যোতি বসুর নেতত্বে সংসদীয় রাজনীতির মধুচক্রে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা জানতেন যে, কিছুদিন এরকম সশস্ত্র বিপ্লবের খেলা খেলে পার্টির উগ্রপন্থী নেতাদের দম ফুরিয়ে যাবে এবং 'বিপ্লবের দীর্ঘজীবী হোক' স্লোগান দিয়ে আবার লেনিন কথিত শুয়োরের খোঁয়াড়ে ঢুকে পড়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া যাবে। কিন্তু তা হয়নি।

প্রথমে গ্রামাঞ্চলে মুক্তিফৌজ ও মুক্তাঞ্চল তৈরি করে পরে শহরের দিকে এগোতে হবে, এই চিনা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই নকশালবাড়ি, শীতলকুচি, সুন্দরবনের একাধিক অঞ্চল, ময়না, নন্দীগ্রাম সহ বেশ কিছু দুর্গম গ্রামাঞ্চলে গোপন সেল তৈরি করে, জমিদখল, ধানলুট ইত্যাদি করে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর নতুন দুর্বল কংগ্রেস সরকারকে উৎখাতের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা শুধু নকশালবাড়িতেই শুরু করতে পেরেছিলেন কানু সান্যালের মতো উগ্রপন্থীরা। নকশালবাড়ি বেছে নেওয়ার কারণ ছিল, চা-বাগান ও জঙ্গলে ঘেরা এই ১০/১২ কিলোমিটার চওড়া মহানন্দা ও মেচি নদীর মাঝে মুরগির গলার (Chicken's neck) দু'পাশে তখন ছিল ভারতের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন পূর্ব পাকিস্তান ও নেপাল। নেপালের রাজা মহেন্দ্রের

পরিকল্পনাই ছিল অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দার্জিলিং, ভুটান, সিকিম, অরুণাচল ও মেঘালয়কে মহানেপালের অন্তর্ভুক্ত করা। আজ সেই পরিকল্পনার ফসল বিধানসভার কালচিনি আসনের উপনির্বাচনে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সমর্থিত প্রার্থীর জয়লাভ। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা আছে।

পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা ১৯৬৫-র যুদ্ধের বদলা নেওয়ার জন্য সবসময়ই সুযোগ খুঁজতেন। এই ভূখন্ড দিয়েই ছিল উত্তরপূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের রেলপথ ও সড়ক পথ। মাটির তলায় ছিল ডিগবয়-বারাউনি তেলের পাইপলাইন। পাশেই মাটিগাড়ায় ছিল সামরিক বাহিনীর ৩৩ নং কোরের সদর দপ্তর এবং বায়ুসেনার গুরুত্বপূর্ণ বাগডোগরা ঘাঁটি। সবকিছু বিবেচনা করেই নকশালবাড়িকে বেছে নেওয়া হয়েছিল ভারতের 'ইয়েনান' বানানোর জন্য।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনে অতিবামপন্থী সিপিএমের নেতৃত্বে গঠিত সংযুক্ত বামফ্রন্টে (ইউ এল এফ) ছিল আর এস পি, এস এস পি, এস ইউ সি আই, নেতৃত্বে গঠিত জনগণের সংযুক্ত বামফ্রন্টে (পিইউ এল এফ) ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক সহ অন্যান্য কিছু দল। এই ফ্রন্টে যোগ দিয়েছিল সিপিআই নেতা বিশ্বনাথ মুখার্জির ছোড়দা ইন্দিরা গান্ধির প্রচ্ছন্ন মদতপুষ্ট কংগ্রেসের দলছুট অজয় মুখার্জির বাংলা কংগ্রেস। এই দুটি ফ্রন্ট বিধানসভার অধিকাংশ আসনেই একদিকে কংগ্রেস ও অন্যদিকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বিধানসভার সব আসনেই এই ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াও প্রায় সব আসনেই চতুর্মুখী, এমনকী পঞ্চমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হয়েছিল। পিএসপি, লোকসেবক সংঘ, জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি ও অন্যান্য ছোটখাটো পার্টিও আসরে ছিল। এই দুটি প্রধান বিরোধী ফ্রন্ট ছাড়াও অন্যান্য পার্টিগুলির মধ্যে ভোট কাটাকাটিতেই বেশ কিছু আসনে কংগ্রেস জিতে যায়, তবু শেষরক্ষা হয়নি। কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার (১৪১) চেয়ে ১৪টি কম আসন পেয়ে ১২৭টিতেই থেমে যায়। অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে, কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠক না করেই, আশু ঘোষ জাতীয় রাজনৈতিক খেলুড়েদের কোন ও সুযোগ না দিয়েই, একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল

কংগ্রেসের গান্ধিবাদী অথচ সর্বত্যাগী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করে দিলেন, 'কংগ্রেস জনসমর্থন পায়নি, তাই বিরোধী আসনে বসবে।'

এর সঙ্গে 'তুলনা করা যেতেই পারে, ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে, এ বছরের পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে, তারপর রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা ১৬টি পুরসভা নির্বাচনে এবং সর্বশেষ ১০টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে জনগণ যখন ক্ষমতার সিংহাসনের চারটি পায়ার মধ্যে তিনটিই ভেঙে দিয়েছে, তখনও সেই একপেয়ে থুবড়ে পড়া সিংহাসনের মোহ ছাড়তে পারছে না সিপিএম।

জ্যোতি বসুর ১ নভেম্বরের বিবৃতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে পড়ে রাজ্যের আসন্ন সর্বনাশ রুখতে, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ঠেকাতে কংগ্রেস সমর্থকদের বামফ্রন্ট প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিতে বলা হয়েছিল। এরই সঙ্গে কি হঠাৎই এক ভুঁইফোড় কংগ্রেসি নেত্রীর প্রকাশ্য প্রচেষ্টায় শিলিগুড়ির মেয়রের পদের নাকের বদলে গোয়ালপোখরের বিধানসভা নির্বাচনের প্লাবনেও ভেসে থাকবার দুরাশা করছে সিপিএম ?

১৯৬৭ সালে নির্বাচনের ফল ঘোষণা হতে না হতেই প্রফুল্ল সেনের ঘোষণা শুনেই পুলকিত জ্যোতি বসু বিশ্বনাথ মুখার্জির সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করলেন। তিনি জানতেন, বিশ্বনাথ মুখার্জি তাঁর ছোড়দা তীব্র সিপিএম-বিরোধী অজয় মুখার্জিকে রাজি করাতে পারবেন। সিপিএমের উগ্র বামপন্থীদের প্রচণ্ড অমত অগ্রাহ্য করেই শুধু নয়, সিপিএম নেতৃত্বে গঠিত ইউ এল এফ (৬৮) বাংলা কংগ্রেস ও সিপিআইয়ের যৌথ নেতৃত্বে গঠিত পি ইউ এল এফের (৬৫) এবং সিপিএম (৪৩) এককভাবে বাংলা কংগ্রেসের (৩৪) থেকে বেশি আসন পেয়েও অজয় মুখার্জিকে শুধু মুখ্যমন্ত্রীর পদই নয়, পুলিশ দপ্তরও ছেড়ে দিয়ে দুটি ফ্রন্ট এককরে যুক্তফ্রন্ট নাম নিয়ে জ্যোতি বসুরা সরকার গঠনের দাবি জানালেন। দুই ফ্রন্ট মিলেও (৬৮+ ৬৫= ১৩৩) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার চেয়ে ৮টি আসন কম ছিল। তাই ঘোর সিপিএম-বিরোধী পিএসপি (৭ আসন) ,গোর্খা লিগ (২ আসন), লোকসেবক

সংঘ (৫ আসন) প্রমুখ দলকে যুক্তফ্রন্টে আনা হল, অবশ্য প্রতি দল থেকেই মন্ত্রী করতে হয়েছিল। ১৯৯৬ তখনও অনেক দূর, প্রকাশ কারাত ও সীতারাম ইয়েচুরিরা তখন কলেজ ছাত্র। তাই সে সময় কোনও 'ঐতিহাসিক ভুল' হতে দেননি জ্যোতি বসু।

কোনও সত্যিকারের রাজনৈতিক দল কেউ বাইরে থেকে ভাঙতে পারে না, দল ভাঙে ভিতর থেকেই। যেদিন জ্যোতি বসুরা আশু সরকারি ক্ষমতার লোভে প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সরকার গঠন করলেন, সেদিনই দল ভাঙনের মুখে পড়ল। কলকাতায় রাজভবনে জ্যোতি বসুরা যখন মন্ত্রীত্বের শপথ নিচ্ছেন, তখন নির্বাচনের আগে নির্ধারিত দলীয় নীতি ও কর্মসূচি মেনেই কানু সান্যালেরা ধান লুঠ ও জমি দখলের বিপ্লব শুরু করলেন। এই বিপ্লবকেই চিনা বেতার বলেছিল 'বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ (The Spring Thunder)। কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা শহরে ও শহরতলিতে লালকালিতে হাতে লেখা পোস্টার পড়ল, 'জোতদারের দালাল মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙারের মুণ্ডু চাই।' পোস্টারেই শুধু নয়, সত্যিকারের মুণ্ডুপাতের খেলা শুরু হল।

নেতৃত্বের নির্দেশমতোই নির্বাচন শেষ হতেই কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, কদম মল্লিক, মুজিবর রহমানেরা কেউ হাতিঘিষা, কেউ বুড়াজোত, কেউ টুকরিয়াঝাড় জঙ্গলে গোপন সেলে চলে গিয়েছিল। মোবাইল ফোনের যুগ আসতে তখন অনেক দেরি। জঙ্গলের গোপন সেল ও শিলিগুড়ি পার্টি অফিসের মধ্যেও যোগসূত্র ছিল পার্টির সংবাদবাহকেরা। মাঝে মধ্যেই এদের গ্রেপ্তার করেই গোয়েন্দারা খবরাখবর জোগাড় করত। মার্চের প্রথম থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত আড়াই মাস, দার্জিলিং জেলার এসপি-র সৌজন্যে, ৫০টিরও বেশি জমি দখল, ধানলুট, মারধরের ঘটনায় এফ আই আর হলেও, কোনও থানাই কোনও তদন্তই করেনি, দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করা বা লুণ্ঠিত ধান উদ্ধার করা তো দূরের কথা।

১৭ মে থেকে ২২ মে পর্যন্ত শিলিগুড়িতে থেকে, গভীর রাতে কানু সান্যাল, সৌরেন বসুদের সঙ্গে সুকনা বনবাংলোয় একাধিক লম্বা মিটিং করে,

চারু মজুমদারের সঙ্গে তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখা করে, হাল ছেড়ে দিয়ে ক্ষুব্ধ হতাশ হরেকৃষ্ণ কোঙার বলেছিলেন, 'আমারই রিক্রুট কানুরা আমারই কথা শুনল না!'

শুনবে কেন? মই তো একটাই। সেই মই দিয়েই কানুদের বিপ্লবের গাছে তুলে দিয়ে জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙারেরা সেই মই সরিয়ে নিয়ে সেই মই দিয়েই মন্ত্রীত্বের গাছে চড়ে বসতে বিন্দুমাত্র দেরি করেননি। নির্বাচনের আগে সশস্ত্র বিপ্লবের ষড়যন্ত্র করে, বিপ্লবের মাধ্যমেই গরিব আদিবাসীদের জমি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কানুদের জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অথচ নির্বাচনের পরেই দুদ্দাড় করে ছুটে রাইটার্স বিল্ডিংসে ক্ষমতার অলিন্দে ঢুকে পড়ে সংশ্লিষ্ট আইনে কোনও পরিবর্তন না করেই শুধু আমূল ভূমি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েই 'বিপ্লব সমাপ্ত' বলে ঘোষণা করে কানুদের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে বলা হল। নেশাভাঙ করিয়ে, হাতে তির-ধনুক, টাঙি, বল্লম তুলে দিয়ে, জমির প্রতিশ্রুতি দিয়ে গরিব আদিবাসীদের বাঘ বানিয়ে, সেই বাঘের পিঠে সওয়ার কানু, জঙ্গল, কদমেরা তখন নামবে কী করে? জমি না দিতে পারলে, তাদের নেতা বলে রেয়াত করত নাকি সরল সাদাসিধা আদিবাসীরা?

মন্ত্রীত্বলোভী জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙারেরা কী ভেবেছিলেন? তাঁরা রাতের বেলায় ক্যাডারদের বলবেন, 'সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করে দাও, বিপ্লব না করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যাবে না, সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না', অমনি ক্যাডারেরা লাঠি-সোটা, তিরধনুক নিয়ে বিপ্লব শুরু করে দেবে। আবার তাঁরাই ভোর হতে না হতেই বুর্জোয়া জমিদারদের পার্টি বাংলা কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রীর সরকারে মন্ত্রী হয়েই ক্যাডারদের বলবেন, 'আর সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজন নেই, আমরা *মন্ত্রী হয়ে গিয়েছি, সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েই গেছে,' তক্ষুনি ক্যাডারেরা লাঠিসোটা তিরধনুক ফেলে ধেই ধেই করে নাচবে?* জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙারেরা কি সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত, মহদেব মুখার্জিদের পুতুল আর নিজেদের বাজিকর ভেবেছিলেন? চারু

মজুমদার তো শিলিগুড়িতে নিজের বাড়ির ইজিচেয়ারে বসে মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙারকে ২০ মে তারিখেই বলে দিয়েছিলেন, আমি আপনাদের রাতের ঘুম কেড়ে নেব।'

মাত্র সাড়ে আট মাস পর ২১ নভেম্বর, ১৯৬৭ রাজ্যপাল সংবিধানের ১৬৪ (১) ধারা প্রয়োগ করে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়েছিলেন। ডা. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নতুন মুখ্যমন্ত্রী হয়েই প্রশাসনকে কড়া হাতে নকশাল উপদ্রব বন্ধ করতে বলেছিলেন। তার আগেই আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে আন্দোলন প্রায় বন্ধ হয়েই গিয়েছিল। কানু সান্যাল তখন পলাতক। তরাইয়ের ভূমি ব্যবহারে সাংঘাতিক অন্যায় অবিচার আছে'—এই ডাহা মিথ্যার উপর এই আন্দোলন টিকে থাকতে পারেনি।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ রিপোর্ট করতে গিয়ে ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত 'বিপ্লবী কৃষকদের গোপন সম্মেলনে' কানু সান্যাল বলেছিলেন যে, 'তাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষা ছাড়াও সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক অভিজ্ঞতা ও শৃঙ্খলাবোধের অভাব ছিল। ফলে পুলিশি অভিযানের মুখে আন্দোলন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।' ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আন্দোলনের জন্য অস্ত্র চাই, গোপনীয়তা রক্ষা করবার কৌশল জানা চাই, আন্দোলনের বিভিন্ন ইউনিট থাকবে। ইউনিটগুলো মাওবাদী প্রচার করে শ্রেণি সংগ্রামকে তীব্রতর এবং সবশেষে গেরিলা কায়দায় শত্রুকে আঘাত হেনে খতম করবে।' এসবই তো মাও-সে-তুংয়ের চিন্তাধারা। একে মাওবাদ বলতে সিপিএমের আপত্তি থাকতে পারে, তাতে কি এসে যায়? ১৯৬৯ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে নকশালরা স্লোগান তুলেছিল এবং পোস্টারে ও দেওয়ালে লিখেছিল, 'পার্লামেন্ট শয়োরের খোঁয়াড়', 'নির্বাচনে শাসক বদলায়, শোষণ বদলায় না।' তারা ওই নির্বাচনে সিপিএম প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কাজ করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেই (ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯) কানু সান্যাল সহ সব বন্দিকেই জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছিল। প্রশাসনের ঘোর আপত্তি এবং মুখ্যমন্ত্রী

অজয়বাবুর আপত্তি সবই মন্ত্রিসভা অগ্রাহ্য করেছিল।

এই নির্বাচনে সিপিএমের আসন সংখ্যা ৪৩ থেকে বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ ৮০ হয়েছিল, সিপিআইয়ের আসন সংখ্যাও ১৬ থেকে বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ ৩০ হয়েছিল, ফরওয়ার্ড ব্লকের আসন সংখ্যা ১৩ থেকে ২১, আর এস পি-র আসনসংখ্যা ৬ থেকে ১২ ও এস ইউ সি আইয়ের আসনসংখ্যা ৪ থেকে ৭ হয়েছিল। এ সব বৃদ্ধি হয়েছিল কংগ্রেসের আসন ১২৭ থেকে ৫৫-তে নামিয়ে। বাংলা কংগ্রেসের আসন সংখ্যা একটি কমে হল ৩৩। অজয় মুখার্জি এবার আরামবাগে প্রফুল্ল সেনকে হারাতে পারেননি। অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী রইলেন বটে, তবে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনসহ এ রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বরাষ্ট্রদপ্তর জ্যোতি বসুকে ছাড়তে হয়েছিল। সুযোগটা সম্পূর্ণ কাজে লাগালেন জ্যোতি বসু। তিনজন প্রমোশন পেয়ে ডিআই জি হওয়া অফিসারকে কাজে লাগিয়ে সাব-ইনস্পেক্টর থেকে কনস্টেবল পর্যন্ত নিচুতলার সব পুলিশকর্মীকে নন- গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতি নামক সংগঠনের মাধ্যমে দলদাস বানাবার কাজ শুরু হল। শহর ও গ্রামে চোর-ডাকাত-লুঠেরাদের কাছে ইঙ্গিত পৌঁছে গেল—সিপিএমে যোগ দাও, পুলিশ আর তোমাদের তাড়া করবে না। প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠনের কিছুদিন বাদেই সিপিএম- অনুগত পুলিশ কর্মচারী সমিতিকে ধর্মঘটসহ সব ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দেওয়া হয়েছিল। পুলিশের মতো এক কঠোরভাবে অনুশাসিত বলকে (strictly disciplined force) দলদাস করে অনুশাসনের বলকে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিলেন জ্যোতি বসু। সে সময় এই নিবন্ধক অর্থ দপ্তরের সংশ্লিষ্ট নথিতে অনেক লিখে লিখেও এটা ঠেকাতে পারেননি।

॥ ৩ ॥

সদ্যস্বাধীন দেশে খণ্ডিত এই বাংলায় প্রথম 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলে হালে পানি না পেয়ে কিছুদিনের মধ্যেই হিংস্র ছাত্র আন্দোলন ও সশস্ত্র শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে সিপিআই রাজ্যের জনজীবন অতিষ্ঠ করে

তুলেছিল। ডা. বিধানচন্দ্র রায় বাধ্য হয়েছিলেন আইন করে ১৯৪৮ সালের ২৫ মার্চ সিপিআইকে নিষিদ্ধ করে দিতে। এর ফলে রাজ্যে শান্তি ফিরে এসেছিল। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান লাগু হওয়ার ফলে সিপিআই পুনর্জীবন পেয়েই আবার হিংসাত্মক কাজ শুরু করে। অসহায় উদ্বাস্তুদের ক্যাডার হিসেবে ব্যবহার করে ১৯৫৩ সালে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধের আন্দোলনের নামে শত শত লুম্পেন লুঠেরাদের দলে ঢুকিয়ে নেয়। একবছর পর শিক্ষক আন্দোলন ও তারপর থেকে বার্ষিক খাদ্য আন্দোলনের নামে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা চরম বিপর্যস্ত করে। ১৯৬৬-৬৭ সালের খাদ্য আন্দোলনে দল লুম্পেন—লুঠেরাদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তারপরই ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে দুর্গম নকশালবাড়ি এলাকার সহজ সরল আদিবাসী ও মদেশীয়দের ধান ও জমির লোভ দেখিয়ে খেপিয়ে তুলে বিপ্লবের নামে কানু সান্যালের জনতা আদালতের রায়ে ব্যক্তিহত্যা, নারীধর্ষণ, দাঙ্গা, ধানলুট, বেআইনি জমিদখল করে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে সংবিধানকে তছনছ করে দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের যে ষড়যন্ত্র করেছিল সিপিএম, তারই ফলে ২ বছরের মধ্যেই দল ভেঙে সিপিআই (এমএল)-এর জন্ম। নকশালবাড়ি আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯৬৭-৭১) শত শত *সাধারণ পুলিশ ও যুবক হত্যা, একজন উপাচার্য, একজন হাইকোর্টের বিচারপতি ও রাজ্যসরকারের একজন সচিবের নৃশংস হত্যা ছাড়াও শত শত পরিবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।* উদগ্র ক্ষমতালোভী সিপিএম সেই অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক রাজনীতির পথ কখনও ছাড়েনি। ১৯৭০ সালের ১৬ মার্চ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পরদিনই ১৭ মার্চ সিপিএমের নেতারা সাঁইবাড়ির নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল।

১৯৬৯ সালের নির্বাচনে সিপিএমের বিধানসভায় আসনসংখ্যা ৪৩ থেকে ৮০ সাংগঠনিক শক্তি বিপুল বাড়লেও, অভ্যন্তরীণ তাত্ত্বিক বিরোধ না কমে বাড়তেই লাগল। ১৯৬৭ সালেই সুশীতল রায়চৌধুরী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

চারু মজুমদারের চিন্তাধারার সমর্থনে চিন্তা, সন্ত্রাস, বিদ্রোহী, ছাত্র ফৌজ, দক্ষিণ দেশ ইত্যাদি প্রচার-পুস্তিকার মাধ্যমে দলের সাংগঠনিক নীতি ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে তীব্র আক্রমণ শুরু করেছিলেন। তাঁরা 'নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি' গঠন করেছিলেন। ফলে পার্টির অভ্যন্তরীণ কলহ তীব্র হল। 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কলকাতা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি' গঠিত হল। এই কমিটির আহ্বানে ১৯৬৯-এর ১ মে মনুমেন্টের নিচে এক সমাবেশ হল। তাতে প্রধান বক্তা ছিলেন কানু সান্যাল। ওই একই দিনে সিপিএম 'মে দিবস' উপলক্ষে বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সভা ডেকেছিল।

একদিকে যখন টগবগে কয়েক হাজার যুবক-যুবতী 'শ্রেণী শত্রু খতম কর' স্লোগান দিয়ে মনুমেন্টের সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিল, তখন অন্যদিকে সিপিএমের মিছিল ঝান্ডার মধ্যে লুকিয়ে ডান্ডা নিয়ে যাচ্ছিল ব্রিগেডের দিকে। ব্যস, লেগে গেল ধুন্দুমার যুদ্ধ। চোখের নিমেষে আশপাশের রাস্তা রণক্ষেত্র হয়ে উঠল। পুলিশ লাঠি চালিয়ে টিয়ার গ্যাস ছুড়ে অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করল। নকশাল যুবকেরাই ছিল বেশি আক্রমণাত্মক। তারা পরিচিত সিপিএম নেতাদের বেদম ঠেঙাল। জ্যোতি বসু ঘনিষ্ঠ এক সাংবাদিককে তাড়া করে প্রেস ক্লাবে ঢুকিয়ে দিল।

নকশাল মিটিংয়ের এক বক্তা সত্যানন্দ ভট্টাচার্য বললেন যে, পুলিশমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পুলিশ নকশালদের মিটিং বানচাল করতে সিপিএম গুন্ডাদের সাহায্য করছে। সমবেত জনতার 'লাল সেলাম' নিয়ে কানু সান্যাল বললেন যে, চারু মজুমদার আজ মাওবাদের প্রধান প্রবক্তা।

নয়া শোধনবাদী সিপিএম মন্ত্রিত্বের লোভে বার বার শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তিনি নতুন দল সিপিআই (এম. এল) গঠনের কথা জানিয়ে বললেন যে, এই দল সংসদীয় নির্বাচনে বিশ্বাস করে না, এই দল চায় সশস্ত্র বিপ্লব, রাইফেলই হবে এই দলের শক্তির উৎস।

আজ থেকে ৪০ বছর আগে কলকাতায় প্রকাশ্য সভায় কানু সান্যাল 'মাওবাদ' কথাটি ব্যবহার করছিলেন। তারপরই কথাটি কথায় ও লেখায়

ব্যবহৃত হয়েছে। আজ কেন সিপিএম নেতারা বলছেন, 'মাওবাদ' বলে কিছু হয় না? কেন সীতারাম ইয়েচুরি নেপালের মাওবাদীদের অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা হয়েও বলছেন, মাওবাদ নামে কিছু নেই?

এভাবেই তিন নম্বর কমিউনিস্ট দলের, লোকে যাকে নকশাল পার্টি নাম দিয়েছিল, জন্ম হল পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে। অনেক আগেই অবশ্য এসইউসিআই এবং আর এসপি-র জন্ম হয়েছিল সিপিআই ভেঙে।

নতুন পার্টির মুখপত্র 'দেশব্রতী'র ১৪ মে সংখ্যায় লেখা হল, সিপিএম এখন একটি বুর্জোয়া পার্টি মাত্র, বিপ্লবী পার্টি নয়। নতুন পার্টির রাজনৈতিক লক্ষ্য ও কর্মসূচি জানাতে গিয়ে বলা হল যে, নতুন পার্টি সশস্ত্র পন্থায় ক্ষমতা দখলের জন্যই চেষ্টা করবে। গেরিলা যুদ্ধ চালাবার জন্য 'মোবাইল গেরিলা স্কোয়াড' গঠন করা হবে। জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর কিছু নকশাল মূল পার্টি সিপিএমে ফিরে গিয়েছিলেন। তাদের একজন কামাখ্যা ব্যানার্জির গলাকাটা দেহ মে মাসের শেষ দিকে পাওয়া গেল নকশালবাড়ি রেললাইনে।

শুরু হল নকশাল আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। খুনোখুনির পর্যায়। এই পর্যায় চলেছিল প্রায় দেড় বছর। খুন হয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল সেন, হাইকোর্টের বিচারপতি এন এল রায়, রাজ্য সরকারের বিচারসচিব রাজারাম বিশ্বাস, হাওড়ার কয়েকজন কংগ্রেস নেতা, শতাধিক সাধারণ পুলিশ কর্মচারী, সরোজ দত্ত সহ শত শত নকশাল নেতা ও যুবক এবং বেশ কিছু সিপিএম ক্যাডার।

তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সি কলেজ এলাকায় প্রায়ই সংঘর্ষ হত। পুলিশ বেছে বেছে নকশাল ছাত্র-যুবকদেরই ধরত, কখনও নিজেরাই মেরে ফেলত, কখনও বা সিপিএম ক্যাডারদের হাতে তুলে দিত মারবার জন্য। এই পর্যায়ে নকশালবাড়ি এলাকা শান্ত ছিল। নতুন উপদ্রুত এলাকা হল মেদিনীপুরের ডেবরা, গোপীবল্লভপুর, বীরভূমের বোলপুরসহ বেশ কিছু এলাকা এবং নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রাণাঘাট ও চাকদহ এলাকা। কিছু এলাকায় (বীরভূম) পুলিশ এনকাউন্টারের নামে নকশালদের মারতে

লাগল, আবার অন্য এলাকায় (মেদিনীপুর) তাদের গ্রেপ্তার ও বিচারের উপরই জোর দেওয়া হয়েছিল।

এই পর্যায়ে রাজ্যে দু'দফায় (১৯৭০ এর ১৯ মার্চ থেকে ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি ৩, ১৯৭১-এর জুলাই থেকে ১৯৭২-এর মার্চ পর্যন্ত) রাষ্ট্রপতি শাসনের সুযোগে প্রশাসন নকশাল দমনে কোনও রাজনৈতিক বাধা পায়নি। সিপিএম তো মহা উৎসাহে নকশাল নিধনে মেতেছিল। পুলিশকে খবরাখবর দেওয়া ও সাহায্য করা ছাড়াও, নিজেরা সরাসরি খুন করত। সরকারি কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির কতিপয় নেতা নিজেদের হাতে নকশাল যুবকদের গলা কেটেছেন। যাদবপুরের লায়ালকার মাঠ ছিল অনেক বধ্যভূমির মধ্যে একটি মাত্র। কাশীপুর-বরানগর এলাকার কথা তো সর্বজনবিদিত। জেল থেকে পালাতে গিয়ে বেশ কিছু নকশাল যুবক পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিল।

১৯৭২ থেকে শুরু করে আজও সিপিএম সিদ্ধার্থশংকর রায়কে নকশাল দমনে যে কৃতিত্ব দেয়, তিনি তা কখনই সজোরে অস্বীকার করেননি। কিন্তু তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন, 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে'। তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বের আমলে চারু মজুমদার যখন ধরা পড়েন এবং মারা যান, তখন তো নকশাল আন্দোলন সম্পূর্ণ স্তিমিত এবং চারু মজুমদার এক পালিয়ে বেড়ানো, নিঃসঙ্গ, সবদিক দিয়েই ব্যর্থ, ঘোরতর অসুস্থ মানুষ।

১৯৪৮-এর ২৫ মার্চ থেকে ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ রাজ্যে নিষিদ্ধ থাকায়, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক ক্ষতি হয়েছিল। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ হিন্দু নিধন মঞ্চে সেদিন থেকে আগত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের আন্দামান ও দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এবং উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলিতে বাগানবাড়ি ও ফাঁকা জায়গা দখল করতে তাদের সাহায্য করে সিপিআই সাংগঠনিক শক্তি অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়েছিল।

১৯৫৩ -এর সহিংস ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে শুরু

করে ১৯৫৪-এর শিক্ষক আন্দোলন এবং ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৯-এর বার্ষিক খাদ্যআন্দোলনের ফলে পার্টির নিচুতলার লুম্পেনাইজেশন সম্পূর্ণ হয়েছিল। এই লুম্পেনদের অধিকাংশই ১৯৬৩-৬৪ সালে পার্টি ভাগের সময় সিপিএমে চলে যায়। এরাই ১৯৬৬-৬৭-র খাদ্য আন্দোলনে সরকারি অফিসে আগুন লাগাতে ও পুলিশ মারতে নেমে পড়েছিল। অনভিজ্ঞ নকশাল যুবকদের খুন করতে অভিজ্ঞ লুম্পেনদেরই কাজে লাগিয়েছিল পার্টি।

১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেস ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি পায়, কেননা দুই সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজিতকুমার পাঁজা কংগ্রেস ছেড়ে এই নতুন দলে যোগ দেন। এই দলের প্রতীক 'ঘাসের উপর জোড়া ফুল', যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে বসেই এঁকেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি সংরক্ষিত প্রতীক বলে স্বীকৃত হয়।

এর ২ মাসের মধ্যেই ২৮ ফেব্রুয়ারি দ্বাদশ লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস একটি মাত্র আসনে বিজয়ী হয়, গণিখান চৌধুরী তাঁর মালদহের আসনটি ধরে রাখেন। অন্যদিকে মাত্র দুমাসের দল তৃণমূল কংগ্রেস কলকাতার ৩টি, যাদবপুর, হাওড়া, বারাসত ও শ্রীরামপুর সহ মোট ৭টি আসনে ও নির্বাচনী জোটসঙ্গী বিজেপি লালদুর্গ দমদমে জয়লাভ করে। তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল বলে গণ্য হয়।

সে বছরেরই মে মাসে অনুষ্ঠিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসই মোট জেতা আসনের নিরিখে জাতীয় কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে দেয়। মাত্র দেড় বছর পরে, ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের হাওড়ার সাংসদের অনৈতিক কার্যকলাপে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা হারানোর ফলে হাওড়ার আসনটি হারালেও, কাঁথি ও নবদ্বীপ আসন দুটি জিতে সর্বমোট ৮টি আসনে বিজয়ী হয় এবং তাদের জোটসঙ্গী বিজেপি কৃষ্ণনগর আসনটিও জিতে নেয়। জাতীয় কংগ্রেস মালদহ ছাড়াও রায়গঞ্জ ও বহরমপুর আসন দুটিতে জয়লাভ করে।

মমতা ব্যানার্জি এনডিএ সরকারের যোগদান করে রেলমন্ত্রী হয়েই বিশাল এক কমর্যজ্ঞ শুরু করেন। তাঁর রেলদপ্তরের দ্রুত বহুমুখী উন্নয়ন পশ্চিমবঙ্গে ২২ বছরের বামফ্রন্ট তথা সিপিএম রাজত্বে রাজ্যের সবদিকেই অধোগমনকেই যেন রাজ্যের আমজনতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। আজ যেমন রেলের বহুমুখী উন্নয়নের ও বিস্তারের কাজে সিপিএম সবরকমে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে, তেমনই তখনও লক্ষ্মণ শেঠের নেতৃত্বে সিপিএম নানাধরনের নাশকতামূলক কাজ করে তমলুক-দিঘা রেললাইন পাতবার কাজে বাধা দিয়েছিল।

১৯৯৮ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গিয়েছিল যে, তৃণমূল কংগ্রেস কলকাতা শহর ও শহরতলির বাইরে গ্রামীণ এলাকায় খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু তার মাত্র তিনমাস পরে অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখা গেল যে, নতুন দলটি বামদুর্গ দাশপুর ও খানাকুলের জেলাপরিষদের দুটি আসন।

দুটি পঞ্চায়েত সমিতিসহ অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতই দখল করেছে। অন্যান্য অনেক লালদুর্গে যেমন- কেশপুর, গড়বেতা, আরামবাগ, পুড়শুরা, কোতুলপুর এবং আরও অনেক এলাকায় পঞ্চায়েতের প্রচুর ঘাসফুল ফুটে উঠেছে। ১৯৯৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মূলত গ্রামীণ কাঁথি ও নবদ্বীপ আসন দুটি দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস গ্রামীণ এলাকায় নিশ্চিত অগ্রগতির আরও প্রমাণ দিল। এরপরই এল সিপিআই সাংসদ গীতা মুখার্জির আকস্মিক মৃত্যুর ফলে গ্রামাঞ্চলের অন্যতম লালদুর্গ পাঁশকুড়া লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন।

১৯৭৫ সালের লোকসভা ক্ষেত্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসের ফলে সম্পূর্ণ গ্রামীণ ৭টি বিধানসভা আসন নিয়ে পাঁশকুড়া লোকসভা আসন আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে প্রাক্তন কংগ্রেসি আভা মাইতি ভারতীয় লোকদল ও জনতা দলের সম্মিলিত প্রার্থী হয়ে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী ফুলরেণু গুহকে প্রায় এক লক্ষ ভোটের ব্যবধানে হারালেও, ১৯৮০ সালের নির্বাচনে

সিপিআই প্রার্থী গীতা মুখার্জি কংগ্রেস প্রার্থী রজনীকান্ত দলোইকে প্রায় লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে জিতে গেলেন। ১৯৮০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ২০ বছর পাঁশকুড়া ছিল লালদুর্গ।

সিপিআইয়ের জাঁদরেল প্রার্থী বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা গুরুদাস দাশগুপ্তকে জেতাবার জন্য স্বয়ং বিমান বসু পাঁশকুড়ায় ঘাঁটি গেড়ে বসলেন। জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এলাকা চষে ফেললেন। রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তাঁর সাংসদ, বিধায়ক ও অন্যান্য নেতৃবন্দকে সাতটি বিধানসভা এলাকায় দায়িত্ব ভাগ করে দিয়ে নিজে মেদিনীপুর থেকে প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় ঘুরে বেড়ালেন। ৫ জুন ভোট হল। ১০ জুন ফলাফল বের হলে দেখা গেল, পাঁশকুড়ায় ইন্দ্রপতন হয়েছে। বামফ্রন্ট প্রার্থী সাতটির মধ্যে মাত্র দুটি বিধানসভা এলাকা, ডেবরা ও পশ্চিম পাঁশকুড়ায় যথাক্রমে ৮ ও সাড়ে ৬ হাজার ভোটে জিতলেও, অন্য ৫টি বিধানসভা এলাকায়, পিংলায় ৩০ হাজার, কেশপুরে ১৮ হাজার, সবংয়ে ১০ হাজার, দাসপুরে ২ হাজার ও নন্দনপুরে ১ হাজার ভোটে হেরে মোট ৪৬ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন।

নকশালবাড়ির অভ্যুত্থানের ৩৩ বছর পর, ২০০০ সালের জুন মাসে ২০ বছরের লালদুর্গ পাঁশকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সম্পূর্ণ গ্রামীণ ওই এলাকায় বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক 'ঘাসের উপর জোড়া ফুল' ফুটে উঠতে না উঠতেই সিপিএম ভয় পেয়ে গেল। এক বছরের মধ্যেই (২০০১ সালের মে মাসে) বিধানসভার নির্বাচন। রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী রেলের উন্নয়নের কাজ করে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সিপিএমের দুর্জয় ঘাঁটি গ্রামবাংলার মাটিতে সর্বত্র 'চুপচাপ ফুলে ছাপ' মন্ত্র নিয়ে দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করেছে মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেস। পঞ্চম বামফ্রন্ট সরকারের পরেই বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের পঞ্চত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সমূলে বিনাশ করতেই কলকাতার রাজ্যদপ্তরে ঘন ঘন গোপন বৈঠক শুরু হল। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে রাজ্যসম্পাদক অনিল বিশ্বাস

উপমুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অবিভক্ত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও হুগলি জেলার, যেখানে ঘাসফুলের বড় বাড়াবাড়ি চলছিল, পার্টি সম্পাদক ছাড়াও আরামবাগের সাংসদ অনিল বসু (সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড মামলার পলাতক আসামি মানিক রায়) এবং গড়বেতার বিধায়ক ডাকাবুকো মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষকে নিয়ে 'তৃণমূলী খেদাও' নামক এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের নীল নকশা তৈরি করলেন। মন্ত্রী ও পার্টি নেতাদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হল।

পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই তিন জেলার পুলিশ সুপারিন্টেডেন্টেদের ডেকে পাঠালেন। তাঁরা কেউই সিপিএমের দলদাসের মতো কাজ করতে রাজি হননি। তাই তাঁদের বদলি করে দিয়ে তিন দলদাস আইপিএস অফিসারকে, যাদের রাজ্য মানবাধিকার কমিশন (গৌরব দত্ত), কলকাতা হাইকোর্ট ও রাজ্য ভিজিল্যান্স কমিশন (এন. রমেশবাবু) বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ভবিষ্যতে কখনও কোন জেলার দায়িত্ব না দেওয়ার সুপারিশ করেছিল, তিন জেলার পুলিশ কর্তা করে দিলেন। তাঁরা পার্টির জেলা সম্পাদকদের সঙ্গে আলোচনা করে নিজ নিজ কাজ বুঝে নিলেন এবং থানার দারোগাবাবুদের ডেকে স্থানীয় সিপিএম নেতাদের নির্দেশমতো কাজ করতে আদেশ দিলেন। সে সময় জনযুদ্ধ (পি.ডব্লিউ. জি) অন্ধ্রপ্রদেশ-ওড়িশা-বিহার হয়ে ঝাড়খন্ডে ঢুকে পড়েছে। গড়বেতা থানার সন্ধিপুর গ্রামের পরিবার থেকে বিতাড়িত (অন্য জাতে বিয়ে করেছিল) অসিত সরকার ঝাড়খণ্ডে ছিল। সে জনযুদ্ধে নাম লিখিয়ে হয়ে গেল মঙ্গল সিং। তার হাত ধরে বাঁকুড়া- মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলে ঢুকে প্রশিক্ষণ শিবির তৈরি করবার চেষ্টা করেছিলেন জনযুদ্ধ নেতা কোটেশ্বর রাও, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাঁকে এখন কিষেনজি নামেই জানে। গড়বেতার সুশান্ত ঘোষ গড়বেতারই সন্ধিপুরের ২নং অঞ্চলের প্রাক্তন সিপিএম পঞ্চায়েত বর্তমানে জনযোদ্ধা অসিত সরকারের মাধ্যমে কোটেশ্বর রাওয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। একাধিক বৈঠকের পর লেনদেন পাকা হল। ঠিক হয়েছিল, জনযোদ্ধারা তাদের অত্যাধুনিক লংরেঞ্জ রাইফেল নিয়ে সিপিএমের 'তৃণমূল খেদাও' অভিযানে

মদত দেবে এবং পরিবর্তে সিপিএম বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলমহলে জনযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ শিবির খুলতে জায়গা ও টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করবে। হার্মাদ কথাটা তখন প্রচলিত হয়নি। কোটেশ্বর রাওয়ের জনযোদ্ধা অত্যাধুনিক লংরেঞ্জ রাইফেল নিয়ে সিপিএম ক্যাডারদের মোটরবাইকের পিলিয়নে বসে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে গড়বেতা ও অন্যান্য এলাকা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। কালো পোশাক পরে কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে প্রতিরাতেই তারা গ্রামে হানা দিয়ে গুলিগোলা চালাত। তাদের ঢুকবার ২/৩ ঘন্টা আগে পুলিশের গাড়ি গ্রামে গিয়ে 'ওয়ারেন্ট' আছে বলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের ভয় দেখাত। জনযোদ্ধাদের বন্দুকের মুখে কর্মীরা গ্রাম ছেড়ে গেলে সিপিএমের লুঠেরাবাহিনী গ্রামে ঢুকে লুটপাট চালাত, মারধর করত। রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাসের যৌথছায়ায় ঢাকা গ্রামে কোনও বিরোধী সমর্থক ফিরে যেতে পারত না।

৯ বছর আগে বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকদের বন্দুকের জোরে গ্রামছাড়া করে নির্বাচনে জিতবার জন্য সিপিএম জনযোদ্ধাদের সাহায্য নিয়েছিল। কাজ উদ্ধার হয়ে যাওয়ার পর অবশ্য সিপিএম জনযোদ্ধাদের ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিল। তারই অন্তিম পরিণতি ২০০১ সালের ৪ জানুয়ারি রাতে ছোট আঙারিয়া গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থক বক্তার মণ্ডলের বাড়িতে বীভৎস গণহত্যা। এই জনযোদ্ধরাই আজ সিপিআই (মাওবাদী) হয়ে সিপিএমের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। মাওবাদী কম্যান্ডার মঙ্গল সিং ওরফে অসিত সরকার ২০০১ সালেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ছাড়া পেয়ে রাজনীতি করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকে তিনি আবার সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে এসে চন্দ্রকোণা থানার কৃষ্ণপুর মহেশপুর এলাকায় সিপিএমের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে মদত দেন। ওইসব এলাকায় বিক্ষুব্ধরা নির্বাচনের আগে হাজারে হাজারে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের পরে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। গত আগস্ট মাসে সুশান্ত ঘোষের বাহিনী এসব এলাকা পুনদর্খল করবার পর গত ২০

সেপ্টেম্বর তপন সুকুরের নেতৃত্বে হামলা করে গড়বেতার সন্ধিপুরে বাড়ির সামনেই অসিত সরকারকে খুন করে।

সেদিন কোটেশ্বর রাও আজ মাওবাদী নেতা কিষেনজি। পাঁশকুড়া লোকসভা আসন হারিয়ে দিশেহারা সিপিএম যদি ২০০০ সালের জুলাই থেকে নভেম্বর মাস জুড়ে জনযুদ্ধের বন্দুকবাজদের প্রত্যক্ষ মদতে হাজার হাজার গ্রামে সন্ত্রাস না চালিয়ে উঠতি রাজনৈতিক শক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের মোকাবিলা শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথে করত, তবে হয়ত ২০০১ সালের নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হত। কিন্তু স্বভাব-হিংস্র সিপিএম সেই পথে হাঁটেনি। তখন সিপিএম 'বন্দুকের নলই শক্তির উৎস' মাওয়ের এই পরামর্শই শিরোধার্য করেছিল। এতেও যদি সিপিএম মাওবাদী না হয়ে থাকে, তবে তারা কী? সেদিনও দলদাস পুলিশ সিপিএমকে সবরকমে সাহায্য করেছিল। ২৪ বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করবার পর ২০০১ সালে তা হারাবার ভয়েই সিপিএম মরিয়া হয়ে গণতান্ত্রিক রীতিপদ্ধতি সব বিসর্জন দিয়ে উন্মুক্ত হিংসার পথ ধরেছিল, মার্কসবাদ ছেড়ে মাওবাদের স্মরণ নিয়েছিল। আজ আবার সিপিএম মার্কসবাদের দোহাই দিয়ে মাওবাদীদের খতম করতে যৌথবাহিনী নামিয়ে জঙ্গলমহলে জনগণের উপর সন্ত্রাস চালাচ্ছে। ২০০০ সালের পাপ তো ২০০৯ সালে বাপকে ছাড়বে না।

আজ সারা দেশে নকশালবাদী পার্টির সংখ্যা ৮০ ছাড়িয়ে গেছে। কোনও কোনও পার্টি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ - স্বামী, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়েই পার্টি। অধিকাংশ পার্টিরই সদস্য ও সমর্থক সংখ্যা ১০,২০,১০০ ছাড়াবে না। অধিকাংশ পার্টিরই মধ্যবয়স্ক নেতরা আর সশস্ত্র দূরে থাক, কোনও বিপ্লবের স্বপ্নই দেখে না। সংসদীয় রাজনীতিই করে। দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, কার্তিক পালদের সিপিআই (এম.এল) এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্টিও শুধু বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সামান্য এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। এ রাজ্যের অনেক নকশাল পার্টির নেতারাই ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে ধর্মতলায় মমতা ব্যানার্জির অনশন মঞ্চে হাজিরা দিতেন ও বক্তৃতা করতেন। দুই আলাদা দলের এক মহিলা ও

এক পুরুষ কিছুদিন অনশনও করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই তৃণমূল কংগ্রেসে ঢুকে গিয়েছিলেন। এখনও তাদের মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা রয়ে গেছেন। অন্য একজন মাঝে মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের মিটিংয়ে মুখ দেখান।

দুটি বড় নকশাল গোষ্ঠী জনযুদ্ধ (People's War Group) এবং এমসিসি (Maoist Co-ordination Commitee) ২০০৫ সালের শুরুতেই মিলে গিয়েই গড়ে উঠেছে গণপতি ও কিষেনজির সিপিআই (মাওবাদী) দল। জনযুদ্ধের উদ্ভব অন্ধ্রপ্রদেশে হলেও, আজ সে রাজ্যে মাওবাদীদের অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে পরিকল্পিত পুলিশি ব্যবস্থা ও অন্যদিকে রাজশেখর রেড্ডির সরকারের গ্রামোন্নয়নে অভূতপূর্ব অগ্রগতি—এ দুয়ে মিলে সে রাজ্য থেকে মাওবাদীদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এমসিসি-র জন্ম বিহারে। সেখানেও আজ মাওবাদীরা অনেকটাই কোণঠাসা। সেখানেও একদিকে কড়া পুলিশি ব্যবস্থা ও অন্যদিকে জে ডি ইউয়ের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণ বিহারে মাওবাদী এলাকা ক্রমশই গুটিয়ে আনছে।

বিহার দ্বিখণ্ডিত হয়ে নতুন ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হওয়ার পর, সে রাজ্যে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন এবং আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য নেতাদের, শিবু সোরেন থেকে মধু কোড়া পর্যন্ত সকলেরই লাগামছাড়া দুর্নীতির সুযোগ নিয়ে জনযুদ্ধ (পি.ডব্লিউ.জি) সেখানের দুর্গম বনাঞ্চলে জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে। খনি ও বনাঞ্চলে চরম দুর্নীতিগ্রস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে মোটা টাকা চাঁদা নিয়মিত তুলে জনযুদ্ধ গোষ্ঠী তাদের আর্থিক অবস্থা মজবুত করে তোলে। ধানবাদের কয়লা মাফিয়ারাও তাঁদের মাসোহারা দিতে থাকে। নেপালের মাওবাদীদের মারফত ল্যান্ডমাইন ও অন্যান্য অত্যাধুনিক চিনা অস্ত্র কিনতে তাদের আর কোনও অসুবিধা ছিল না। এ ছাড়া ধানবাদের বেআইনি দেশি অস্ত্রের কারখানাগুলো থেকে অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করা অনেক সহজ হয়ে যায়।

২০০৯ সালের জুন মাসে লালগড়ে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে যৌথবাহিনীর অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় ৬০ জন সিপিএমের কর্মী ও সমর্থক মাওবাদীদের হাতে খুন হয়েছে। আরও খুন হয়েছে ৪/৫ জন পুলিশ। ২জন পুলিশ নিখোঁজ। ঝাড়খণ্ড পার্টি ও তৃণমূল কংগ্রেসের ১০/১২ জনও খুন হয়েছে সিপিএমের প্রতিরোধ বাহিনীর হাতে। যৌথবাহিনী ঐ পর্যন্ত মাওবাদীদের সঙ্গে ৫/৬টি গুলির লড়াইয়ে কোনও সুবিধাই করতে পারেনি।

জনগণ ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক মাওবাদীদের সঙ্গে কোনও লড়াইয়ে যেতে চাইছে না। কাজেই যৌথবাহিনী ঘোর জঙ্গলে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে এক অসম লড়াইয়ে নিজেরা যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, মাওবাদীদের সে তুলনায় প্রায় কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। মনে হয়, এভাবে চললে যৌথবাহিনী কোনও সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

আর মাত্র ১৭ মাস বাদে বিধানসভার নির্বাচন। নির্বাচনের আগে পর্যন্ত এরকম অচলাবস্থা থাকবে বলে মনে হয়।

সৌজন্যে : দৈনিক স্টেটসম্যান ১০, জানুয়ারি ২০১০